Vol. 4 | No. 1 | 1960

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য শিশির

Volume	4
Issue	1
Year	1960
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কুমার ঘোষ
Published online	June 15, 1960
DOI	10.62328/sp.v4i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v4i1.2
Pages	37-76
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাল

Check for updates

শিশির কুমার ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কাব্যপ্রকাশ কি সিদ্ধি ও সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল, না, যেমন অভিযোগ শোনা গিয়েছে, নির্বাণোন্মুখ এই রচনা দুর্বল, স্বধর্মচ্যুত, কাব্যশক্তির এই ক্ষীণ প্রবাহ তত্ত্ব[১] আর গদ্যের বালুরাশিতে পথহারা, রবীন্দ্রপ্রতিভার কোনো বিশেষ স্বাক্ষর এখানে পাওয়া যাবে না? কিন্তু এ হোল স্পষ্টত নিন্দুকের বা অক্ষমের অতিভাষণ। ক্লান্তকবির সাময়িক আত্মধিক্কারকে নির্বিচারে প্রমাণ হিসেবে প্রয়োগ করা সুবুদ্ধির লক্ষণ নয়। একটি মহৎ ও সুদীর্ঘ কাব্যজিজ্ঞাসার শেষ অধ্যায় সম্পূর্ণ নিরর্থক হতে পারে এ কথা সহজ বুদ্ধিতে মেনে নেওয়া শক্ত। হয়তো বিপরীতের এই বিচিত্র সমাহারে বিচার-বুদ্ধি বিব্রত বোধ করবে, হয় তো কোনো একটি নিটোল পরিণতি বা স্থির লক্ষ্য দেখা যাবে না এই লেখায়, হয়তো বা রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের সঙ্গে এর বর্তমান সংযোগ সামান্যই,—তবু, বিস্তৃত ভাবে না হলেও এর একটা মোটামুটি পরিচয় নেবার ও দেবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

এ প্রসঙ্গে কাব্যের অনুভব বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি, কাব্য আদৌ অনুভবের বিষয় কিনা, তার কোনো উদ্দেশ্য আছে বা থাকতে পারে কিনা, এই জাতীয় নৈয়ায়িক উদ্দেশ্যবাদী বা 'সেমান্টিক' বিতর্ক খুব অপরিহার্য নয়।

---

১ তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য। "শ্যামলী", পৃ : ১৬

না :

Through all the.....days of my youth.
I swayed my leave and flowers in the sun ;
Now I may wither into the truth.
Yeats.

কোন নির্দিষ্ট জ্যামিতিক ছকে[২] রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যকে ফেলা যাবে না একথা ঠিক। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি ও কাব্যপ্রকাশ উভয়েরই যন্ত্রের চেয়ে সূক্ষ্মতর, নিজস্ব কোনো সর্বান্বয়ী সূত্র বা রীতি, ছন্দ বা সংহতি অবশ্যই আছে, অন্ততঃ থাকা সম্ভব। (আর তা যদি না হয়, যদি দেখা যায় যে ঐক্যের চাইতে বৈচিত্র্যের প্রতি তার অধিক আকর্ষণ, তাহলে সে দিকটিও ভেবে দেখা দরকার)। শেষের একটি লেখায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

আমি কবি তর্ক নাহি জানি
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে
("রোগশয্যায়", নং ২১)

সে দিক দিয়ে শেষের এই কবিতাগুলির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। সরু-মোটা তারের এই সংযোগক্ষেত্রে ঘন বিন্যাস ও শ্লথ বাক্যস্ফীতির সহ অবস্থান ঃ "কোথাও তার সমতল কোথাও অসমতল।" এই ভাঙা-গড়ার বা বৈপরীত্যের গভীরে কোনো অবচেতন ইঙ্গিত থাকতে পারে।

মোটামুটিভাবে বলা যায় ঃ গদ্য-কবিতাগুলিতে ব্যাখ্যানবৃত্তির প্রাধান্য, এর ঢিলেঢালা ঘরোয়া ভাষণভঙ্গিতে অনেক সময়েই "ছোটো-খাটো আবর্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে আনমনা চিত্ত প্রবাহে ভেসে-যাওয়া অসংলগ্ন ভাবনা" (পত্রপুট, পৃ ৭)। কিন্তু ঘরোয়া রীতিতে এই সব "দেখার টুকরো"র ফাঁকে ফাঁকেই ব্যতিক্রম দেখা যায়, বিপরীত ভঙ্গির ইঙ্গিত ও আকস্মিক উল্লাস, যেমন 'পত্রপুট', ৩নং কবিতায় অথবা 'শিশুতীর্থে'। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে প্রথমটি "দুঃসহ দ্বন্দ্বে দোলায়িত মহাবীর্যবতী" প্রকৃতি-দর্শনের নমুনা, দ্বিতীয়টি নবজাতক বা মহামানবের আবির্ভাব ঘোষণার দ্যোতক। নির্মোহ প্রকৃতি ('হে উদাসীন পৃথিবী···') ও মহামানব আগমনী, —রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে এই দুইয়ের সাঙ্গীকরণ করলেন, বা করলেন না, তাও লক্ষণীয়। তাঁর নিজের কথাতেই ঃ

যে মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলেনি তার.....
যুগে যুগে সে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয় জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়.....
("পত্রপুট", পৃ ৪০—৪৩)

---

২ But who shall parcel out
His intellect, by geometric rules,
Split, like a province, into round and square ?
Wordsworth, The Prelude, II, 208—10.

পরবর্তী গ্রন্থে, "প্রান্তিকে", অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে—"অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায় দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি"—আত্মসাক্ষাৎকারের অভীপ্সা ঃ

ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড়হাতে
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।
("প্রান্তিক", নং ১)

অন্তর্লোকের এক নাটকীয় পর্যায়কে অতিক্রম করার দ্রুত ও সাহসিক প্রচেষ্টা এই "প্রান্তিক"। "নক্ষত্রবেদীর তলে" এর রূপরেখায় ছড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য "কৃষ্ণ অরূপতা"। একেবারে শেষের, ১৭ ও ১৮ নং কবিতা দুইটিতে রাজনীতির উল্লেখ হয়তো অপরাপর লেখার সঙ্গে খাপ খায় নি, কিন্তু একটি বিশেষ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তিম দশায় কবির তীব্র প্রতিবাদ—"The Poet can only warn"—এবং আসন্ন সংগ্রামের ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ রবীন্দ্রমানসের এ একটি দিক-নির্দেশ। পরবর্তী চারটি কাব্যগ্রন্থ—"সেঁজুতি", "আকাশ প্রদীপ", "নবজাতক" ও "সানাই"—এক সূত্রের না হলেও তাদের সঙ্গতি লক্ষ্যগোচর। প্রথম দুটির নামকরণ থেকে বোঝা যায় তারা শেষ বিদায়ের আলো, প্রধানত অতীত-মন্থনের মৃদু বিষণ্ন কাব্য। "নবজাতক" গ্রন্থে একাধিক নব্য রীতির আভাস, 'ঐতিহাসিক' চেতনা তার মধ্যে অন্যতম। "সানাই" নানা দিক দিয়ে অতীতাশ্রয়ী ঃ "বৈকাল বেলা ফসল ফুরানো ক্ষেতে···সকাল বেলার স্মৃতিখানি (তার) মনে"। সর্বশেষে দেখা দিল প্রান্তস্পর্শী কক্ষচ্যুত ভাবনা ও দুঃসহ বেদনায় পরিকীর্ণ চারিটি কাব্য—"রোগশয্যায়", "আরোগ্য", "জন্মদিনে" ও "শেষ লেখা"। এদের মধ্যে প্রথম গ্রন্থ দুটিতে অসুস্থতার কথা, কিন্তু তাই বলে বিকার বিকৃতির কোনো চিহ্ন নেই, যদিও আজ কবিকে এমন অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে 'সুস্থ' অবস্থায় যা অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে ঃ [৩]

অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি
অনাদি আকাশে।
("রোগশয্যায়", নং ১)

৩ "Until we are sick, we understand not."

এ-কথা সে-কথা মনে আসে.....
ঘুমের তো দায় নেই, এলোমেলো স্বপ্ন তাই গড়া।...
আপনার মাঝে তাই পেতেছি প্রমান
স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান।
("আরোগ্য", নং ২৬)

মনের মধ্যে ঘোলা স্রোতের জোয়ার ফুলে ওঠে
ভেসে চলে ফেনিয়ে ওঠা অসংলগ্নতা।
("জন্মদিনে", নং ২৪)

এ সময়কার কিছু লেখা নিতান্ত ব্যক্তিগত যদিও "আমিশূন্য আমি"র ("রোগশয্যায়, নং ২২) কথাও রয়েছে অন্যত্র। ব্যক্তিজীবন ও বিরাট বিশ্ব-বিবর্তন এবং অভিব্যক্তিকে এক করে দেখার একটি আশ্চর্য উদাহরণ পাওয়া যাবে "জন্ম দিনে" ৫ নং কবিতাটিতে "সাবিত্রী পৃথিবী"র বন্দনায়। আবার এই এবং তার আগের কাব্য গ্রন্থেই দেখতে পাবো বৃহত্তর সমাজমানসের, জনগণের প্রতি প্রবীন কবির বিনম্র নিবেদন, নিজ কাব্যকলার অপূর্ণতার পূর্ণ স্বীকৃতি, ও সেই সঙ্গে ভবিষতের কবির আবাহন ও নির্দেশ। এর পরে রয়েছে মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "শেষলেখা"। বলাবাহুল্য, চড়ুই পাখি বা দৌহিত্রীর বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লঘু বা চিরাচরিত রচনার জন্য এর মূল্য নয়, বরং এই বিরলভাষণ কাব্যের যে আসামান্য মাহাত্ম্য পাঠককে বিস্মিত ও অভিভূত করে তা বিশেষভাবে দেখা যাবে ১৩ ও ১৫ নং নাটকীয় কবিতা দুটিতে, অথবা অন্য কয়েকটি লেখায় যেমন 'রূপনারাণের কূলে···' বা 'প্রথম দিনের সূর্য···'। উত্তরকাব্যের অন্তরাকাশ ভেদ করে এদের যে সংকেত, সে-রহস্যের উপলব্ধির চেষ্টায় একালীন রচনা ও কবিচেতনার সত্য ও অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া সম্ভব, কিন্তু এখানে তার ইঙ্গিত করে নিরস্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। "প্রান্তিকে"র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রূপক নাট্য আরও তীব্রভাবে শেষবারের মত ঝংকৃত হয়েছে। এ কোন খেয়াপারের গান? (মনে রাখা ভাল যে এর প্রথম লেখাটি—'সমুখে শান্তি পারাবার···'—শ্রাদ্ধবাসরের জন্য রচিত হয়েছিল।) কবির এই শেষ লেখায় আর্তি, বেদনা, হতাশা ও বিস্ময়, অজ্ঞেয়তা, 'নিপুণ শিল্পে'র যে-চরমে যাত্রা করেছে সেখানে, কাব্যের গোত্রান্তর না ঘটিয়ে, গন্তব্যে পৌঁছনো হয়তো সম্ভব নয়।

তার পর? সে উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের। রবীন্দ্রোত্তর কাব্য কতদূর ও কি ভাবে সে দায় বহন বা স্বীকার করেছে সে প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনার বাইরে।

* * *

এ কথা না মেনে উপায় নেই যে উত্তরকাব্যের সমস্ত রচনাই সম পর্যায়ের নয় এবং একে পুরোপুরি গ্রহণ বা সমর্থন করা কঠিন। আমাদের মূল প্রবন্ধে এমন অনেক লেখার উল্লেখ রয়েছে যাদের মধ্যে অন্তত বারো চৌদ্দটি এমন কবিতা পাওয়া যাবে রবীন্দ্র কাব্যে ও বিশ্বসাহিত্যেও যার দোসর পাওয়া কঠিন। সংখ্যায় অল্প হয়েও তারাই আমাদের আলোচ্য ও অনুধেয়। অনেক কিছু, "পর্বত প্রমাণ ভস্মরাশি"র (শেষ সপ্তক, পৃঃ ৩১) বাইরে যা রইল তার মূল্যও অসামান্য। এ জাতীয় কবিতার অপেক্ষাকৃত নূতন ও অপরিচিত স্বাদ সব সময়ে সুখকর নাও হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব ও পরিচিত রূপের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য ও সম্পর্ক নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি, চেতনা ও কাব রীতির বৈশিষ্ট্য, একাধারে তাদের নিরাভরণ সরলতা ও ঘনত্ব, অন্তরঙ্গতা ও সুদূরতা, ক্ষয় ও বৃদ্ধি লক্ষ্য না করে উপায় নেই। এই লেখাগুলি রবীন্দ্রকাব্যে একটি অভিনব বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা (Dimension) এনে দিয়েছে ঃ

মোর চেতনায়
আদি সমুদ্রের ভাষা ওংকারিয়া যায়।
(জন্মদিনে, নং ৯)

এদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যঞ্জনা যে দৃষ্টির অগোচর থাকবে তা একমাত্র অনপনেয় অন্ধতেই সম্ভব। 'রবীন্দ্রমানসে'র সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে বোধহয় সেই অন্ধের দেশেই আমরা বাস করছি। ব্যর্থতা, অবক্ষয় ও আধুনিকতাকে নির্জিত, অতিক্রম করে এ-কবিতাগুলিতে কালান্তরের যে-কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে তাকে চিনে নেবার চেষ্টায় নতুন আলোয় আমাদের রবীন্দ্র-পরিচয় ও আত্ম-পরিচয় সম্ভব হতে পারে। একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলেছেন, আমরা যে কোনো কবিতা পড়ি না কেন, কাব্যের সংজ্ঞার কিছুটা অদল-বদল হয় সে কবিতা পড়ার ফলে। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ গতানুগতিক কবিতা এ-জাতীয় কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু কদাচ দু'একটি এমন আশ্চর্য কবিতার জন্মলাভ ঘটে যাকে স্বীকার করতে হলে কাব্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা-বিশ্বাসে বিপ্লব ঘটানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের

উত্তরকাব্যের শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট কবিতাগুলিকে স্বীকার বা উপলব্ধি করার অর্থই হলো রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে আমাদের অভ্যস্ত ধারণার আমূল পরিবর্তন করা।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে "চঞ্চলের লীলাসহচর" রবীন্দ্রনাথকে কোনো সাদা নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা যাবে না। রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার বহুমুখিতা—সকল সমালোচকই একবাক্যে সে কথা স্বীকার করেছেন—যদিও তার হেতু বা মূল্যনির্ণয়ে কেউই বিশেষ মাথা ঘামান নি। এ কথা সত্য যে তাঁর বহু বিচিত্র কাব্য "জাত-খোয়ানো প্রিয়া ভদ্র-নিয়ম ভাঙা। আসন পাবার কাঙাল ও নয় তো আচার মানা ঘরে" (সানাই, পৃঃ ৪৯)। সচেতন বা পরিমিত প্রয়াস সে-প্রতিভার লক্ষণ নয়। বেশিক্ষণ, বা কখনই, তিনি স্থির থাকতে পারেন না, কোনো ধ্রুব প্রত্যয়ের বড়াই সেই চঞ্চলা কাব্যলক্ষ্মীর নেই। শেষ পর্যন্ত পথে বিপথে চলেছে সেই কাব্যের ধারা, "অলক্ষ্য পথের যাত্রী অজানা তার পরিণাম"। স্থির, নিশ্চিত—বা নিশ্চিন্ত—সমাপ্তি এই প্রতিভার অনুকূল নয়, একই গ্রন্থে তিনি বারবার সাজবদল করেছেন, একই কবিতায় দেখা গিয়াছে বহুবিধ গৃহবিবাদ। মূল প্রবন্ধে তার কিছু উল্লেখ বা ইঙ্গিত আছে, কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে গোটা রোম্যান্টিক দ্বৈধতা[৪] রবীন্দ্রকাব্য জুড়ে বসে আছে। কেন? এই বিচিত্রতা ও দ্বৈধতার বিচার করা সমালোচকের দায়িত্ব ও, সম্ভব হলে, কোনো সূত্রে তারা গ্রথিত কিনা তারও সন্ধানী হওয়া। সেই সঙ্গে এসে পড়ে রবীন্দ্রকাব্যের রূপ ও জাতিনির্ণয়ের বৃহত্তর প্রশ্ন। রবীন্দ্রকাব্যের একটি সামান্য অংশ নিয়েই আমাদের কারবার, কাজেই "সমগ্র স্বরূপে" রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় আমাদের বর্তমান প্রয়াসের বাইরে।

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরকাব্যের বিচার ও মূল্যনির্ণয় হতে পারে, হয়েছে ও হবে একথা স্বীকার করে নিয়ে আমরা কেবল দু'একটি প্রাথমিক ইঙ্গিত বা অভিমত এখানে নিবেদন করতে পারি। সত্য কথা বলতে কি, রবীন্দ্রকাব্য বিচার করবার জন্য সমালোচককে কবির সমতুল্য—যদিনা সূক্ষ্মতর—অনুভব, বিচারশক্তি ও সমন্বয়বীর্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন।[৫] একথা বললে কেউ হয়তো অপরাধ নেবেন না যে রবীন্দ্রসমালোচকদের মধ্যে সেই আদর্শ পুরুষের—সমগ্র উত্তরকাব্যের

---

৪ "romantic dilemma," John Bayley, The Romantic Survival.

৫ "We can judge no furthr but by larger experience...we read fine things, but never feel them to the full until you have gone the same steps as the author." John Keats.

চড়াই-উৎরাইয়ের মানচিত্র যাঁর নখদর্পণে, সমান দক্ষতা বিশ্লেষণে ও সংশ্লেষণে, দেশী-বিদেশী, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে যাঁর অবাধ সঞ্চরণ,—সন্ধান অদ্যাবধি দুর্লভ। ব্যক্তিগত মেজাজের সমর্থন বা অভিমত প্রকাশ করা তো অন্য ব্যাপার। স্থান-টায়ানার ভাষায়, সে হোলো আত্মচরিত কথা, সমালোচনা নয়,। অধিকাংশ রবীন্দ্রসমালোচকের বিশিষ্ট বক্তব্য আছে, যার পরিচয় লাভে রবীন্দ্ররসিক মাত্রেই উপকৃত বোধ করবেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের, তা সে সনাতনী বা বামপন্থী যা-ই হোক না কেন, নিজস্ব মূল্য আছে—যদিও কাব্যালোচনার কালে সাম্প্রদায়িক মতামত প্রচারের নির্বিচার আগ্রহ ও সংকীর্ণতা অনুমোদন করা কঠিন। যতদূর জানি, রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য, আপাতবিরোধ, তার অন্ত্যলীলা সম্পর্কে কোনো সমালোচকই চূড়ান্ত কথা বলতে পারেন নি, অধিকাংশ তো সমস্যাকে এড়িয়ে গেছেন। আমাদের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা ও ভুলভ্রান্তির ফলে যদি সেই প্রত্যাশিত সমন্বয়ী টীকাকারের আবির্ভাব সম্ভব হয় তাহলে প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি জানবো। আমাদের এই প্রবন্ধ ছিদ্রান্বেষীর হাত এড়াবে না জানি। এর কতকগুলি ত্রুটির কথা—যেমন ভাবের বা সমস্যার অর্থাৎ বিবৃতির প্রতি, কবিতার চেয়ে কবি মানসের ও তার একটি বিশেষ পরিণামের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া, কবির পূর্বরচনার সঙ্গে তুলনা, বিশেষকরে 'স্টাইল' ও 'স্ট্রাকচার' সম্বন্ধে আলোচনা হতে বিরত থাকা[৬] — আমি স্বীকার করেছি। এ ছাড়াও, নানা কারণে, অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক আলোচনাই বাদ পড়েছে। আত্মরক্ষার্থে বলা প্রয়োজন যে উত্তরকাব্যের প্রতি এই দৃষ্টিপাত শেষ নয়, সব নয়। আমার দিবস-রজনী ঘনযামিনী কেটেছে যার সাহচর্যে, এ-প্রবন্ধে সে মন দেওয়া-নেওয়ার কতটুকুই বা ধরা পড়েলো! তবু যতটুকু বলতে পেরেছি তাতে খাদ মিশোবার চেষ্টা করি নি এবং, যেহেতু স্বকৃতের জন্য দুর্বলতা এড়ানো কঠিন, আশা আছে যে এই আলোচনা—সত্য বলতে আলোচনার সূত্রপাত—রবীন্দ্রনাথের বিবিধ প্রয়াস, সম্ভাবনা ও সিদ্ধি সম্পর্কে দু' একটি ভাবনার, আনন্দের কিছু আভাস হয়তো দিতে পারবে। হয়তো বা সেই নতুন দেখার ফলে রবীন্দ্রপ্রতিভা ও ঐতিহ্য নিয়ে স্তিমিত আগ্রহে কিছুটা ইন্ধন মিলবে, চলতি ফ্যাসনের ও ভক্তমণ্ডলীর বাইরে ব্যাপকতর স্বীকৃতি পাবে এই প্রতিভা। কেউ হয় তো জেগে প্রশ্ন করবেন ঃ

---

৬ অথচ আধুনিক সমালোচকদের মতে, কাব্যের সাড়া জাগে "by its syntax more than by its sentiments," কাব্যকলা "essentially a disturbance of the conventional language."

দেবায় হবিষা বিধেম? হয়তো বা আবার নতুন করে জানা যাবে, যেমন ব্র্যাডলে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে একজন মহৎ কবি এসেছেন। আরও আনন্দের বিষয় যে এই মহত্ত্ব "গীতাঞ্জলি"র কাছ থেকে যা পাওয়া বা আশা করা গিয়েছিল তার থেকে সম্পূর্ণ বা অনেকাংশে ভিন্ন।

ব্লেকের মতে জ্ঞানমার্গে কোনো রকম সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা নিতান্ত নির্বোধের কাজ। রবীন্দ্রসমালোচক মাত্রই একথার যাথার্থ্য প্রতি পদে হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন। সৌন্দর্যরসিক, সত্য সন্ধানী এই নিঃসঙ্গ কবি যার সমবেদনার উদারতম ব্যাপ্তি ভোলেনি "কীটের সংসার" বা "সঙ্গের কুকুর"কে, "বুনো চারাগাছটি" কা "মাকড়সার জগৎ ও পিপড়ের অন্তরের যবনিকা"কে, সেই কবিকে বাঁধবে এমন নির্মল সিদ্ধান্ত কোথায়? যেমন বিরতি ছিলনা তাঁর কাব্যরূপায়ণের তেমনি বিরতি নেই আমাদের কাব্যজিজ্ঞাসার। যদি মিথ্যা সমাপ্তির কুহকে না পড়ি, সমালোচনার যূপকাষ্ঠে অভিজ্ঞতাকে বিসর্জন দিতে না চাই, তা হলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার করবার জন্য প্রয়োজন হবে এমন একটি সিদ্ধান্ত বা অনুভব পরম্পরার যা বন্ধ দরজা নয়, খোলা জানালা। কোথায় পাব বিচারের সেই খোলা জানালা, অভিজ্ঞতার সেই আকাশ দিগন্ত? তাঁর কাব্যে, আর কোথায়: সেকথা আমরা বার বার বলেছি, তাই আমাদের আলোচনার প্রধান এবং বলতে গেলে একমাত্র সূত্র। কবি আমাদের আলোচনার উপলক্ষ্য নন, আদ্যন্ত তিনিই আমাদের প্রধান সাক্ষী ও সহায়। রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চিনবো, নান্যঃ পন্থা। আর একটু এগিয়ে একথাও বলা চলে যে কাব্যই কাব্যের টীকা, একটি কবিতা আর একটি কবিতাকে, একটি কাব্যগ্রন্থ আর একটি কাব্যগ্রন্থকে বুঝতে সাহায্য করবে, কেননা "সার্বিক বোধে" (তারা) একশরীরী।[৭]

এ ছাড়াও বর্তমান যুগে সমালোচনার কয়েকটি ধারার প্রাধান্য রয়েছে: কাব্যদেহ নিয়ে আলোচনা, সামাজিক-ঐতিহাসিক ও মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে মূল্যায়নের পদ্ধতি। অনিবার্য কারণবশতঃ প্রথম ধারাটি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি, এবং অন্য দুটির আভাস দিয়ে থাকলেও কোনো বিশেষ ব্যাখ্যানরীতি বা মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনি। তাতে সুবিচারের চেয়ে অবিচারের আশংকা বেশি মনে হয়েছে।

---

[৭] সমালোচনার এই রীতিটি স্বীকৃত হয়ে থাকলেও বর্তমান প্রবন্ধে তার যথেষ্ট উদাহরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এলিয়ট একসময় বলেছিলেন যে সমালোচকের কাজই হোলো কাব্যসত্তাকে জিইয়ে রাখা, কবিতা আলোচনার কালে কখন ভুলতে চলবেনা কবিতার কথা, অন্য অবান্তর কিছুর দ্বারা সেই সত্য যেন না হারায়। সেই শুদ্ধ কঠিন বিচারে উত্তরকাব্যের বেশির ভাগ লেখা বাতিল হবার সম্ভাবনা, তাদের মনে হবে অসম্পূর্ণ তাড়াহুড়োয় নানা জাতের লেখা, কখনো বা পুরানো লেখার চেহারা বদল বা "দাগা-বুলানো" মাত্র। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের "অসাবধান রচনার বর্জনীয় স্ফীতি" ও সংখ্যাধিক্য বোধ হয় তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ। সময় বিশেষে যে মহৎ কবিরাও অনুত্তম রচনায় যথেষ্ঠ দক্ষতা দেখান তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে এ-জাতীয় রচনা প্রকাশ করায় তাঁদের বিন্দুমাত্র আপত্তি দেখা যায় না। উত্তর কাব্যের বেশির ভাগ লেখাই প্রতিভাবান কবির খসড়া মাত্র। তা সত্ত্বেও—হয়তো তাই!—তাদের নিজস্ব মূল্য, এদের দুর্বলতা ও সংহতির অভাবই অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সামনে কবিমানসের, সেই অবিরাম কর্মশালার, "ভাসা রচনার" নানা নিরুদ্ধদুয়ার খুলে দেয়।[৮] একথা যে কেবল সেই সব কবিতায় যেখানে তিনি সচেতন আত্মসমর্থনের চেষ্টা করেছেন—এবং যার ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে—তাদের বেলায় খাটে তাই নয়, যে সব লেফায় আত্মরক্ষা বা সমালোচনার তেমন বিশেষ উল্লেখ নেই সেখানেও কবি মানসের, সচেতন বা অচেতন, অন্তরঙ্গ আলেখ্য বা প্রতীক বর্তমান। যেমন "পত্রপুট" ১১ নং লেখাটি: "দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল আপন লীলার প্রবাহ"। একজন শিল্পীকে জানার অর্থই হোলো তিনি কি করতে চেয়েছিলেন তা জানা। সেই যোগসূত্র বা প্রয়াসপরম্পরা হাতের কাছে পাওয়া গেলে তাকে উপেক্ষা করার হেতু নেই। এ তো সর্বজনবিদিত যে মহৎ শিল্পীর দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাও অনুধাবনযোগ্য, অনেক সময় তারাই আবার তার সার্থক সৃষ্টির স্বকৃত সমালোচনা।

এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে এখনকার অধিকাংশ লেখার পিছনে প্রেরণার বিশেষ তাগিদ নেই, নেই অভিজ্ঞতা বা প্রকাশের সেই বেদনা, সেই অবশ্যম্ভাবিতা—দান্তে যাকে বলেছেন "the panther quest"—যা বাদ দিয়ে মহৎ কবিতা রচিত হতে পারে না। এ-জাতীয় লেখা পড়ার সময় আমরা দেখতে পাই না কাব্যের

---

৮ "……it is pleasant to see great works in their seminal state pregnant with latent possibilities of excellence".

Samuel Johnson.

নিরন্তর সংগ্রাম ও অক্ষয় সততা, অতীত এবং বর্তমানের সমীকরণ ; শব্দকে, সমগ্র কবিসত্তাকে, শিল্পের নবীনতায় উজ্জীবিত করার সার্থক ইন্দ্রজাল এই সহজ খেয়ালী বা শ্রান্ত রচনায় কমই চোখে পড়বে। এখন আবার অনর্গল ভাষণের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দৈহিক ও মানসিক অবসাদ। ভিক্টোরিয় যুগের ধুরন্ধরদের অধিকাংশ লেখার মতো এদেরও যে বিস্মৃতির অতলে অবসান ঘটবে এ অনুমান অযৌক্তিক নয়। এত না লিখলেও পারতেন, অন্তত সবলেখা প্রকাশ না করলেই বুঝি ছিল ভাল,—বহু পাঠকের মনে সেই একই কথা আসবে। এ বিষয়ে স্বয়ং কবি আত্মগ্লানির হাত থেকে পরিত্রাণ পান নি। উদাহরণ ঃ "পুনশ্চ", পৃঃ ১৮ ; "পত্রপুট", পৃঃ ৬২ ; "রোগশয্যায়", নং ১ ও ২৬ ; "জন্মদিনে", নং ১২ ; এবং শেষ লেখা", নং ৯। তিনি নিজেকে সমর্থন করেছেন এই বলে যে এ লেখাগুলি শিল্পের দিক দিয়ে সার্থক বা সমর্থন যোগ্য না হতে পারে, কিন্তু এদের সাহায্যেই তার কাব্যের ঐতিহাসিক ধারাটি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে—অন্তত তাঁর বিদ্যানুরাগী বন্ধুবর্গ তাঁকে এই বলে বুঝিয়েছেন ("নবজাতক", পৃঃ ৭৬—৮)। এই সুহৃদবৃন্দ, যদি না সম্পূর্ণ কাল্পনিক হন, বন্ধুবৎসল কবিকে সৎপরামর্শ দেন নি।

সব মিলিয়ে এই সময়কার লেখায় দুর্বল কবিতারাই দলে ভারী। এদের মধ্যে আবার কোথায় নূতন ও সার্থকতর সৃষ্টির ইঙ্গিত ও উপাদান রয়েছে তা অনেকের চোখ এড়িয়ে গেছে। অদ্যবধি "প্রান্তিক" তো রবীন্দ্রভক্তের কাছে অনাদৃত রইলো। শেষের কাব্য চতুষ্টয়ও যে পাঠকমহলে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। "প্রান্তিকে"র মত 'ঘন' লেখার সমবেশ হয়তো বড় বেশি নেই, কিন্তু উচু জাতের একাধিক কবিতা উত্তরকাব্যের স্বল্প পরিসরেও ছড়ানো আছে। যথা "পুনশ্চ"র 'একটি মানুষ', "পত্রপুট", নং ৩ ('আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, হে পৃথিবী'), "জন্মদিনে", নং ৫ ('জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে'), ঐ, নং ১৪ ('পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে'), "শেষলেখা" নং ১৩ ও ১৪ (রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম' ও 'প্রথম দিনের সূর্য')। তালিকা বাড়ানো যায়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা মানেই সূক্ষতর কবিতা, আজ আবার তারা অনেক সময়ই নিদারুণ নাটকীয় এবং দ্বন্দ্বমুখরও বটে। পৃথকভাবে এই লেখাগুলির, বা এদের কতকগুলির প্রতি ডাইনে—বাঁয়ে দুই দলই দৃষ্টিপাত করেছেন কিন্তু এদের যথার্থ মূল্য, সত্য নির্দেশ ও উপভোগ রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্র অভিব্যক্তিতে তাদের স্থান আজও নিরূপিত হয়নি। রাশি রাশি প্রায়-কবিতার ভীড়ে মণি উক্তিরা হয় হারিয়ে গেছে অথবা বিরাজ করছে সুদূর গিরিশিখরের মৌন মহিমায়, অনাদৃত,

সঙ্গীহীন। হয়তো অভাব ছিল প্রয়োজনীয় বিচার-সামর্থ্যের, যা অন্যতম রবীন্দ্র-সমালোচক[৯] একারান্তরে স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া যে রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের আলোকে উত্তরকাব্যের মূল্য ও পরিচয় নিরূপিত হবার কথা, সে আপাতত চলেছে অন্য খাতে। একাধিক অর্থে, ও কারণে, রবীন্দ্রকাব্য নিঃসম্পর্ক, বিশেষ করে তাঁর উত্তরকাব্য ঃ রবীন্দ্রনাথের পূর্ব রচনা ও তৎপরবর্তী কাব্যের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক সে বিষয়ে অধিকাংশ পাঠকের মনে স্পষ্ট ধারণার অভাব ; তা ছাড়া অনেক সময়েই মনে হয়েছে যে বিশ্বসংসারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে রবীন্দ্রকল্পনা বুঝি বিমুখ বা অপারগ, "অসীম বৈরাগ্যের" (শেষলেখা, নং ৯) বেদিতেই বুঝি তার শেষ পরাজয় বা প্রণতি। রবীন্দ্রনাথকে অর্থাৎ উত্তরকাব্যের রবীন্দ্রনাথকে, নিঃসঙ্গতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করার দায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের কবিদের। কিন্তু অধিকাংশ আধুনিক কবিই সেদিক থেকে সজ্ঞানে মুখ ফিরিয়েছেন। দু একজন তো সরাসরি বিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছেন। সেই বিস্ময়কর বিপজ্জনক প্রতিভাকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা বা সৎবুদ্ধি তাঁদের অধিকাংশের নেই। তাছাড়া তাঁদের কারো-কারোর প্রয়োজন হয়েছে "রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত" হবার। সব মিলিয়ে উত্তরকাব্যর ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল নয়। অবশ্য আমরা তা মনে করিনা—তা হ'লে এ প্রবন্ধ লেখার সার্থকতা কোথায়? ইতিপূর্বে উত্তরকাব্য সমালোচনার জন্য আবশ্যকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বা পটভূমিকার কথা বলেছি। এখন, সংক্ষেপে, সে দিক থেকে দু'একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে কবি এখন সাধারণ জীবনের কাছে 'নেমে' এসেছেন, বা আসতে চেয়েছেন। "টবের কবিতাকে রোপণ করব মাটিতে" (শেষ সপ্তক, পৃঃ ৮৩),—এই তাঁর মনের কথা, অন্তত তাই তো তাঁর মনে হয়েছে। তিনি নতুন যুগের নতুন ধরণের লোকসাহিত্য লিখবেন। এবং—বিপদের সূত্রপাত এই খানেই—তাঁর ধারণা সে-কাজ একমাত্র গদ্যের বাহনেই সম্ভব হতে পারে। গদ্যের মারফত কাব্যের মুক্তি, এ-জাতীয় অভিমত প্রকাশে এককালে কবির যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছে। কিন্তু এই পরীক্ষা সফল বা স্বধর্মোচিত হয়েছিল কিনা কে বলবে? যাই হোক দীর্ঘকাল এই নব্য রীতির পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁর সম্ভব হয়নি। এবং এই রীতিতে লিখিত অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য রচনাই তার সুপ্রচারিত মতবাদের পরিপূরক নয়, বরং বিপরীত। এর আপাত অসজ্জিত ভাব কাব্যবোধের কিঞ্চিৎ

৯ শ্রী অমিয় চক্রবর্তী।

প্রসার ঘটিয়ে থাকতে পারে, হয়তো বা "দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে" (শেষ সপ্তক, পৃঃ ৮০)। তবুও, গদ্যকাব্যের সরলতা—"ভাষার গৃহস্থালী"—এক মধুরে মরীচিকা, জনসমাজের বহুদূরে, "ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে" তার "বাসা" ঃ "লোকে যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ব" (পুনশ্চ, পৃঃ ৪৩)। রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন না কেন, "কল্পনার সূত্রে বোনা জালে" "আভিজাতিক ছন্দের" (পুনশ্চ, পৃঃ ১৬) দোলা তাঁর রক্তে। একটু অন্যভাবে সুধীন্দ্রনাথ বোধ হয় সেই কথাই বলতে চেয়েছিলেন, গদ্য কবিতার ভাষা "উন্নীত চেতনার ভাষা"। শুধু গদ্যকবিতারই বা বলি কেন? কিন্তু কবির ধারণা যে এই রীতিতে তিনি এমন অনেক কিছু লিখতে পেরেছেন যা অন্য কোনা উপায়ে লেখা সম্ভব ছিল না। এই ধরণের সফল রচনার সংখ্যা বেশি নয়ঃ শিশুতীর্থ', কয়েকটি আখ্যানমূলক কবিতা, 'ছেলেটা' বা 'শেষ চিঠি', 'চিররূপের বাণী', ও 'পত্রপুট' নং ৩ (যদিও শেষেরটি নিয়ে মতভেদ আছে)। কিন্তু একথা বলা বাতুলতা যে 'শিশুতীর্থ' বা 'পত্রপুট' ৩ নং লেখাটির ভাব ও ভাষা লোকসাহিত্যের, বা, তাদের রচনারীতি, কবির ভাষাতে বলতে গেলে, 'কোপাই'-এর ছন্দে বাঁধা। দুটি লেখাই স্মরণীয় সন্দেহ নেই, যদিও কিছুটা অসংলগ্ন ও প্রগলভ। ঘরোয়া ঢঙের কবিতাগুলির মধ্যে সে বোধ যেন আরও স্পষ্ট। এই হোলো উত্তরকাব্যের একটি দিক, আভিজাত্যের "উচ্চ মঞ্চ" হতে নেমে এসে উদার জনসমাজের, "অখ্যাত জনের" সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের, কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিলম্বিত সৎ প্রয়াস। কিন্তু রবীন্দ্রানুভূতি আজন্ম-সূক্ষ্ম, নিঃসঙ্গ, নভোচারী, স্বভাবকে অস্বীকার বা অতিক্রম করা তার সাধ্যাতীত। সে বৈদগ্ধ্য বা মেজাজ—সহজে "শ্রেণীহীন" হবার নয়। হয় তো শ্রেণীবৈষম্যের ঊর্ধ্বে সে চিরকালের কোন "সুদূরের মিতা"। শেষ পর্যন্ত বেদনা ও দূরত্ববোধই তাকে মর্যাদা দিয়েছে, সফলতা নয়। সাধারণ মানুষ ও পাঠক তাঁদের জন্য রচিত (?) এই উদ্দেশ্যমূলক লেখার মধ্যে নিজেদের "দোসর জন" খুঁজে পাবেন এ-আশা কম। প্রসঙ্গত এমন কথাও বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথকে—"আমি ব্রাত্য"—নিজের বলে দাবী করতে পারে এমন কোনো গোষ্ঠী বা সমাজসত্তা নেই, বোধ হয় থাকা সম্ভব নয়। সুসভ্য ভদ্রমণ্ডলী ক্ষুব্ধ হবেন জানি, কিন্তু কথাটি ভেবে দেখা দরকার। ইয়েটস দান্তেকে যেভাবে "the chief imagination of Christendom" বলে অভিহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করা আদৌ সম্ভব নয়।

"প্রকৃতির কবি" রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে কেবল "অখ্যাত জনের" বেদনা অনুভব করেছেন তাই নয়, তিনি অনুভব করেছেন মহামানবের আগমনী, এবং সেই বিশ্বাসই তাঁকে ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করেছে। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা ও অক্ষমতার সুনিপুণ প্রয়োগে তিনি অদ্বিতীয়। থেকে থেকে উৎকণ্ঠায় উৎকীর্ণ হয়ে উঠেছে শেষের এই কাব্য, কখনও নির্মোহ প্রকৃতিবন্দনায় কখনও বা "মানবের শিশু" "নবজাতকের" আবির্ভাব সম্ভাবনায়। কিন্তু এই কি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতার স্বরূপ? কবির অন্তিম বেদনা যে "নির্বাক মনের মর্মের বেদনা" একথা বিশ্বাস করা কঠিন। গদ্য কবিতা আরম্ভ হয়েছিল সাধারণ মানুষের প্রতি শুভেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, তাদের সান্নিধ্য কামনা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বেজেছে অন্য তারেঃ "তাই আমি মেনে নেই সে কথা আমার সুরের অপূর্ণতা"। সামাজিক বিশ্লেষণ বাদ দিলেও শুদ্ধ কাব্যবিচারে এর বেশির ভাগ লেখাই সাহিত্য বা রসোত্তীর্ণ হয় নি।

তার জন্যে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে, "প্রান্তিক" ও কবির জীবনের শেষ দুবছরের লেখার জন্যে। বিবৃতিপ্রচার হতে মুক্ত, অভিজ্ঞতার স্বকীয় প্রকাশ এদের অধিকাংশ লেখার মধ্যে, জনগনের কবি হবার সাধ তার মিটেছে। আজ প্রবীণ কবির সামনে একটি আশ্চর্য জগৎ উদ্ঘাটিত হচ্ছে, অন্তর্লোকের যে-বাণী তারা বহন করে এনেছে "বর্তমানে সে কেহ পড়িতে না জানে"। রবীন্দ্রনাথের কাছে বেদনা ও অসুস্থতায় জারিত সেই অন্তিম কাব্যে আমরা নতুন করে, ঘুমভাঙা চোখে দেখতে শিখলাম রবীন্দ্রকবিকে।

ক্ষণিক মুহূর্তভরে চরম আলোকে
দেখে নেই স্বপ্নভাঙা চোখে;
চিনে নেই এ লীলার শেষ পরিচয়ে
কী তুমি ফেলিয়া গেলে, কী রাখিলে অন্তিম সঞ্চয়ে।

(নবজাতক, শেষ কথা)

পূর্বজ রীতির বিষণ্ণমধুর কাব্য এখনও এখানে সেখানে শোনা যাবে, যেমন "সানাই"-এ। কিন্তু এই সুদূরাকাশের বার্তাবাহী শেষের কবিতায় সে-রবীন্দ্রনাথ

উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে

সে রূপ সহজে ভোলার নয়। তামসীর সঙ্গে এই বোঝাপড়া

ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে

তার মরণাত্মক দ্যুতি উপমা বা ভাববিলাস নয়। জীবনের সর্বশেষ মূল্য দিয়ে আত্মপরিচয়ের দুঃসহ রক্তক্ষরণ টীকা এই শেষ লেখায়। রাহু কথিত—"রাহুর মত মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া"—এই কাব্য রবীন্দ্রনাথের কীর্তিনাশা কীর্তি। অন্ধকার রাত্রির হৃদয় হতে ছিনিয়ে আনা এই বিজয়ী কাব্য যত আশ্চর্যই হোক না কেন, এই লেখাগুলিই আমাদের কাছে অধিক মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। তাদের প্রাণ-শক্তি, মানব-অভিজ্ঞতার মূলাধারকে উদ্যত করার কথা বাদ দিলেও এর ফলে তিনি বাংলা কাব্যে যে উত্তুঙ্গ সম্ভাবনার দিকটি খুলে দিলেন তাতে সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। যুগে যুগে কবি ও প্রবক্তার দল যে জ্যোতির্ময় উন্মেষের কথা বলেছেন, যে সর্বার্থসাধিকার স্বপ্ন দেখেছেন, শেষ প্রশ্নের অপর পারে সে আলোর আলো—

দেখি নি অদৃশ্য আলো
আঁধারের স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে, যে আলোক
নিখিল জ্যোতির জ্যোতি ; দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদিয়া
আমার আপন ছায়া.....

(প্রান্তিক, নং ১০)

রবীন্দ্রকাব্যজিজ্ঞাসাও "ভাষাহীন শেষের উৎসবে" যাবারকালে সেই নিহিতার্থের, তিরস্করণীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্তর্মুখী খণ্ডকাব্য আর মহাকাব্যোচিত ব্যাপ্তির দুঃসাহসী সমীকরণে, আদিকাব্যের মহাপ্রয়াণের পত্রে যাত্রা করেছে আধুনিক কালের কবিমনীষীর এই তটস্থ কাব্য। এই সেই যুগযুগধাবিত বহুবাঞ্ছিত সম্ভাবনা—

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল বেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তর লোকে

(পত্রপুট, নং ১০)

—যা সে এতদিন লালন করে এসেছিল তার কাব্যদেহের মণিকোষে, এই বুঝি তার অসম্পূর্ণ কাব্যের—"for ever unfinished"—শেষ স্বীকারোক্তি, কখনও বেদনায় বাক্যহারা ঃ

আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে—

কখনও বা তীব্র আর্তনাদের সুরে ধ্বনিত হয়েছে সেই শাশ্বত, নির্মম আদি প্রশ্ন ঃ

কিন্তু কেন.....
বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের তীব্র আর্ত স্বর
ধ্বনিবে না কোনো উত্তর।
("নবজাতক" পৃঃ ১১-৪ ; ৭১)

সমাজ সচেতন ও আত্মজিজ্ঞাসু, এই দুই রীতির মাঝামাঝি তাঁর গৌণ রচনায় ঠাসা ঃ অনেক সময়ই স্মৃতিবহ, পরিচিত ভাব ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি, কখনও ক্লান্ত কখনও বা এরই মধ্যে লেগেছে আধুনিকতার আমেজ বা মৃদু চমক। এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কবি জীবনের একটি অন্তরঙ্গ পৌনঃপুনিক হিসাবনিকাশ করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। এ শুধু পুনরাবর্তনের ইতিহাস নয়, এতে রয়েছে অগ্রগমনের সূচনা। রবীন্দ্রসমালোচক এদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন, বা পেতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, "দূরত্ব" দূর করার কথা আবার এসে পড়ে। গদ্যকবিতায় তার প্রথম আভাস। তবে কেবল রীতি বা আঙ্গিক পরিবর্তনের দ্বারাই কোনো কবি সমগ্র সমাজ সত্তার প্রতিভূ বা গণকবি হয়ে ওঠেন না। অন্তত রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা সম্ভব হয় নি। তার জন্য প্রয়োজন ভিন্ন পরিবেশ ও প্রস্তুতির, সমাজতত্ত্ববিদদের নিরেট হিসেবে তা ধরা নাও পড়তে পারে। রবীন্দ্রনাথের বেলায় এক নব্য নাগরিক, কিছুটা ক্ষয়িষ্ণু ও পরীক্ষামূলক রীতি অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোনো বড় রকমের 'হার্দ্য পরিবর্তন' ঘটেছিল বলে মনে হয় না। তিনি চিরনিঃসঙ্গ ঃ "সবা হতে আমি দূরে" (জন্মদিনে, নং ২৯)। নানা উপমার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন তাঁর এই নবার্জিত, পরিবর্ধিত দৃষ্টিকোণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দৃষ্টিকোণের ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে—যদিও সে প্রকাশটি অতি সূক্ষ্ম ও মর্মস্পর্শী।

আপনার উপতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।
(নবজাতক, পৃঃ ৫৩)

সত্য কথা বলতে কি, উচ্চগ্রামে তিরস্কার বা আত্মসমর্থনের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক তাঁর হতাশা বা ব্যর্থতার ব্যঞ্জনা।

রবীন্দ্রনাথ "শ্রেণীহীন" কবি হবার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন নি। মুক্ত মানবের যে-ছবি তিনি হৃদয় রক্তে মুদ্রিত করেছেন তার সঙ্গে সাম্যবাদী ভাবাধারার বিশেষ সাদৃশ্য পাওয়া যাবে না। হেথা নয়, হেথা নয়, সে অন্য কোন খানে, তপস্যার অন্তর্লোকে সেই মানব অভ্যুদয়। কোন সাগর বেলায় সেই মহামানবমেলা?

অবশ্য রাবীন্দ্রিক অভিজ্ঞার আদ্য ভিৎ হোলো প্রকৃতি, আজ তার সঙ্গে, বা পরিবর্তে, এসেছে চির—বা মহামানব স্বীকৃতি। এবং এই স্বীকৃতির কালেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন তার বিশ্বাসের ইতিবাচক দিকটি, যদিও অধিকাংশ আদর্শবাদী কল্পনার মতই একে ইতিহাস বা ঘটনা না বলে আস্পৃহা বা ভবিষ্যদ্বাণীর পর্যায়ে ফেলতে হয়। এর অর্থ নয় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে লিখিত কবিতাগুলির আবেদনকে আমরা অস্বীকার করছি। বেদনায় আনত, কখনও আক্রোশে উদ্বেলিত, কী অর্থবহ সেই আন্তরিক আবেদন! কিন্তু শুদ্ধ বিচারে, হয়তো কাব্যের চেয়ে বিবৃতি হিসাবেই তাদের মূল্য বেশি, এবং সামাজিক পরিবেশের চেয়েও কবির মানসিক স্থিতিকেই যেন তারা অধিকতর স্পষ্ট করে তোলে। লেখাগুলির অসামান্যতা কেউই অস্বীকার করবেন না, তাদের কয়েকটি তো বারংবার উদ্ধৃত হয়ে থাকে, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগের চাইতে বিচ্ছিন্নতাই এদের মধ্যে ফুটে উঠেছে বেশি করে। বিশ্ববিক্ষোভে কবির ভূমিকা দর্শকের, সক্রিয় কর্মীর নয়। ভবিষ্যতের কবি "কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা" অর্জন করবেন তিনি সেই আশা করেছেন, নিজেকে সেই কবির আসনে বসাতে চান নি।

কিন্তু রাজনীতি বা সামাজিক পরিবেশ তো সমগ্র মানবজীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ, আধুনিক কালে তাদের উপর যত অভিনিবেশ হয়ে থাকুক না কেন[১০]। সম্পর্কের, মূল্যবোধের অন্যান্য ও বৃহত্তর রূপ বা পরিধি থাকতে পারে, ও আছে। রবীন্দ্রনাথ মানবসম্পর্ককে কোনো দিনই তুচ্ছ করেন নি: "মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই"। তার সাহিত্য ও জীবনদর্শন প্রধানতঃ এই অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত। শেষের একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন "মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি সুধার আস্বাদ" (আরোগ্য, নং ২৯)। অন্যত্র: "দুঃখপাত্রে সুধাভরা এই ক'টি দিন" (রোগ শয্যায়, নং ১৪)। কিন্তু অধিকাংশ কবিই, তিনি নিজেও, যে

---

১০ "In our time the destiny of man presents its meaning in political terms." Thomas Mann.

ভাবে তাকে ব্যাখ্যা করে এসেছেন, আজ অনুভবের প্রত্যন্ত সীমায় তাদের আর সেই পূর্ণমূল্য দেওয়া সম্ভব নয়। আজ তাদের মনে হয়েছে বড় বেশি প্রাণিক, আত্মকেন্দ্রিক। "পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সংগমে" চোখে পড়ে এক ব্যাপকতর দৃষ্টির সূচনা, আগেকার সেই রমনীয় প্রহর ও প্রয়োজন আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। "জন্মদিনে" একটি লেখায় নং ২৯—"বন্ধুজনের" উল্লেখের ব্যাপারে সংকোচের সুর স্পষ্ট। এ যেন কোনো বিদগ্ধ সৌজন্যের প্রকাশ, পাছে এই বিদায় বেলায়, নির্মোহ নতুনের স্পর্শে অন্যের আঘাত লাগে। তিনি স্বয়ং এক অজ্ঞাত, বৃহত্তর জগতের অভিমুখে চলেছেন। এ-অভিজ্ঞতার তাত্ত্বিক ও ভাবপ্রবণ উভয়প্রকার ব্যাখ্যাই সম্ভব। আজ কোনো রকম পূর্ব সিদ্ধান্ত, সচেতন আদর্শবাদ বা ভাবোদ্দীপনের প্রযত্ন-প্রয়াস নেই, অধিকাংশ সময় কবির অভিজ্ঞতা বেদনা ও বিস্ময়বোধে বিলীন হয়ে গেছে, কোনো সুদূর সম্পর্কের সীমানায় সে বাঁধা পড়ে নি। রিক্ত উদাসীন "শূন্যপানে চেয়ে', এই লেখা পড়তে বসে মনে হয় এ যেন কুয়াশায় আঁকা কোনো ছায়াপথ, দূরের বা নিকটের ঘটনা বা কর্তব্যের কথা স্মরণ করা কবির পক্ষে দায়সাধ্য। অন্য দিক দিয়ে দেখলে এরা এবার, যেমন নীহাররঞ্জন বলেছেন, এক নতুন ঐহিক কাব্য। সাংখ্য ও চৈনিক রসাভাসে রচিত এই লেখা—"পুনশ্চ", পৃঃ ১০৫—০৬, "রোগশয্যায়", নং ৮, ৩৫ ও "শেষ সপ্তক", পৃঃ ৮—৯—রবীন্দ্রকাব্যে একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি যা দেখেছিলেন—বা তাঁকে যা দেখানো হয়েছিল—সে সম্পর্কে মোটামুটি প্রশংসা ও অনুমোদনের সুরেই তিনি অভিমত দিয়েছিলেন। অবশ্য—বিষয়টি বামপন্থী সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় নি—সোভিয়েট দেশে যা তাঁকে সব চেয়ে আশ্চর্য করেছিল সে হোলো নিরক্ষরতার অবসান, ১৯১৭ সালের রাষ্ট্রবিপ্লব বা তার কলাকৌশল নয়। নতুন সাহিত্যগোষ্ঠী ও সাহিত্য চিন্তা তাঁকে আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত করেছিল বলে মনে হয় না। বহুকাল পরে, সমসাময়িক তরুণ বাঙালী কবিকে [১১] লেখা এক চিঠিতে তিনি "মার্ক্সিজমের গোরখানায়" সমাধিস্থ হবার আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। হৃদয়হীন সমাজ ব্যবস্থার "উচ্চ মঞ্চে" তিনি যে খুব সোয়াস্তিতে বসেছিলেন তা মনে হয় না, কিন্তু সাময়িক আত্মকৃপা, অনুশোচনা বা প্রতিবাদের কথা বাদ দিলে, তাঁর স্বপ্নালু, ভাবমধুর আদর্শ কবিকল্পনা সামাজিক অসাম্যের দরুন যে বিশেষ প্রভাবান্বিত

১১ শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

হয়েছিল বলা চলে না। প্রতিবাদের আকস্মিক তীব্রতা, ও অপরাধীভাবের ইঙ্গিত (একটি নতুন সুর), থেকে সে কথা অনুমান করতে পারি। এ প্রতিবাদ ক্ষণস্থায়ী এবং কবির সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাতে নেই, বরং যেমন ইয়েটসের কিছু লেখায়, তাতে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট সরলীকরণ করা হয়েছে। সে দমকা হাওয়া আবার মিলিয়ে গেছে তিনি ফিরে আসতে পেরেছেন "পরীর দেশে", রূপকথার ছড়ার ছবির রাজ্যে, মনোরমার স্বপ্নমায়ায়। সভ্যতার সংকটে ত্রাণকর্তার সম্পর্কে তিনি যে আশা পোষণ করতেন তার কতটা আত্মরক্ষার্থে কে বলবে? বিশ্ববিধানের সেই নিহিতার্থকে তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ করতে পেরেছেন বলা যায় না।

ব্যাপারটি অন্যভাবে বলা চলে। আধুনিক শাস্ত্রের ভাষায়, রবীন্দ্রনাথ হলেন অন্তর্মুখি মানুষ ইন্‌ট্রোভার্ট'। তাঁর সুরক্ষিত ভাবরাজ্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনার অনধিকার প্রবেশ তাঁর মনঃপূত হয়। তাদের মেনে বা মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। তাদের বাদ দেওয়াই বা কি সহজ? ("স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে"?) অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও অভিশাপ বর্ষণের কারণ হয়তো যে তিনি এই ব্যাপারগুলিকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত হন। তাছাড়া —যেমন আগেই লক্ষ্য করেছি—তার রয়েছে ত্রাণকর্তায় বিশ্বাস, যে-বিশ্বাস শেষ দিক্‌কার লেখায় অধিক স্পষ্ট। কিন্তু সমাজসত্তাকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি সত্তার প্রকাশ সার্থক না সম্ভব? রবীন্দ্রনাথের মুক্ত পুরুষের কল্পনায় সামাজিক যুক্তি বা পরিবেশের কথা গৌণ বা অপ্রাসঙ্গিক। এখানেই হয়তো আদর্শবাদের চরম চমৎকারিত্ব। এই বিশ্বাস, এই সূক্ষ্মতর বিদ্রোহ ও মুক্তিভাবনা নির্ভর করছে সনাতন তপস্যার উপর। অথচ তপস্বীর বা জ্ঞানীর পূর্ণ দৃষ্টি হতে লিখিত নয়, তার কাব্য। অপর দিকে "যারা কাজ করে·····অন্তর মিশালে যে অন্তরময়" তাদের কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কিন্তু তাদের সঙ্গেই বা তার সাযুজ্য ও সহযোগ আছে কি? একটি তার বেদনার কারণ, অন্যটি তার বেদনার ধন। প্রথমটিতে তিনি অনুভব করেছেন অনুকম্পা দ্বিতীয়টির উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা। দুয়ের মাঝে পড়েছে দাহ আক্রোশ ও অভিশাপের এলাকা। মানবতপস্বী বা মানবকর্মী কারুর সঙ্গেই তিনি যথেষ্ট যুক্ত নন, যদিও তাঁর আদর্শবাদী ও অভিজাত চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা যে কোন দিকে সে কথা বোঝা কঠিন নয়।

রবীন্দ্রকবির অন্তরতম তর্পণ কিন্তু অন্য বেদীতে। ক্ষণিকার, সুন্দরের, আনন্দপুরুষের পাদপীঠতলে। এখানে, শেষ কথা না বলে থাকলেও, তিনি অপরকে অনায়াসে ছাড়িয়ে গেছেন। ভারতীয় তত্ত্বের দিক দিয়ে বলতে গেলে শক্তি বা

জ্ঞান—বোধ হয় প্রেমও—তাঁর কাছে গৌণ। বহুকাল পর্যন্ত একটি সূক্ষ্ম রহস্যবোধই রবীন্দ্রচিত্তের অন্তর্গত বলে মনে হয়েছে। এবার সেই প্রকৃতিকাব্যে ঈষৎ হেরফের লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রকৃতির পরিবর্তে বা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে মানব-দর্শন, যদিও সেই আদর্শবাদী সুরের কোনোরকম ব্যতিক্রম এতে ঘটেনি। কবিচিত্তের নিঃসঙ্গতা মহামানব বা নবজাতক কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে। অপরের সাহায্যে মুক্তি, এ-চিন্তা কতদূর ভারতীয় বিচার্য। রাবীন্দ্রিক মহামানব কবির স্বভাব ও স্বধর্মানুযায়ী গড়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, একাধিক সংস্কৃতির স্রোতধারায় উজ্জীবিত সে সাধনা, সে আরাধনা, ভবিষ্যতের সে ছায়াছবি। কিন্তু এই আদর্শের বা সম্ভাবনার প্রয়োগ হয়েছে কতকটা গৌণভাবে, কিছুটা যেন দায়ে পড়ে। কখনও প্রার্থনার সুরে, কখনও বা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে ধ্বনিত হয়েছে সেই মহালগ্নের আগমনী, কিন্তু প্রজ্ঞাঘন দৃষ্টি যা হবে জীবনের সম্যক দর্শন, জীবনায়ন—ভবিষ্যতে, রবীন্দ্রকাব্যের আলোকে যার আশা করতে পারি—সে বুঝি রয়ে গেল আভাসেই। রবীন্দ্রনাথ সেই আবির্ভাবের নান্দীপাঠ করে গেলেন। কিন্তু প্রশ্ন ঃ তপস্বী ও মহামানব, উদ্ধার করবেন কাকে,—নিজকে না অপরকে? এ বিষয়ে কবির বিভিন্ন বিবৃতি যে-সাক্ষ্য দিক না কেন, তাঁর কাব্যে—যেখানে কবিমানসের সত্যতর, ঘনিষ্ঠতর আলেখ্য—কর্মবাদ এবং প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু তিনি বলেন নি। "শিশুতীর্থে'র শেষ দিকে নবজাতকের অনায়াস অবতারণা কতকটা ভোজবাজির মত ঠেকে; "শেষ লেখা" ৬নং কবিতাটিতে মহামানব বন্দনা আকাশবাণীর মতই ফোন শূন্য হতে ভেসে এসেছে। 'শিশুতীর্থে'র এই পরিণামের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, শেষপর্যন্ত ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য ঠেকে। দৃষ্টির সত্যের ও সততার চাইতে রমণীয় সমাপ্তি, শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতি এর ঝোঁক বেশি। 'ঐ মহামানব আসে' সাম্যবাদী ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুরোধে সভা সঙ্গীত হিসাবে লিখিত হয়েছিল এ-সংবাদে বিস্ময় বাড়ে। সংস্থান বা বিন্যাসের দিক দিয়ে লেখাটির দুর্বলতা—যেমন 'শিশুতীর্থে'—অধিকাংশ পাঠককে এড়িয়ে গেছে। এর সমগ্র আবেদন সংহত হয়েছে একটি মাত্র পঙক্তিতে, এর অবিস্মরণীয় মন্ত্রসম প্রথম পঙক্তিতে। কবিতাটির অন্যান্য অনুষঙ্গ কিন্তু প্রচলিত উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যার চেষ্টা, সাধারণ বিবরণ। আশু সংকটকালে রবীন্দ্রনাথ নৈতিক-আধ্যাত্মিক কর্মফল, সম্ভাবনা, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিবাদের কথা শুনিয়েছেন, সাময়িকতায় জর্জরিত হতবীর্যদের কাছে এনেছেন আশার বাণী ঃ

যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণ শক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে
(নবজাতক, পৃঃ ১৮)

'যদি'! এর কতটুকু অন্তর্দৃষ্টি এবং কতটা দায়ে পড়ে বলতে হয়েছে বলা কঠিন। এতে অবাক হবার কিছু নেই যে এ লেখাগুলি তাঁর সমগ্র রচনা হতে কিছুটা স্বতন্ত্র এবং এদের ফলে কয়েকটি কবিতায় যেমন "জন্মদিনে", নং ২১—আশ্চর্য সংক্রমণ (transition) পাওয়া গেলেও সব মিলিয়ে এরা কবি চিত্তের একটি অমীমাংসিত ভূমির প্রত্যাদেশ বহন করে এনেছে। কবির বিশ্বাস সরল বা অর্জিত কোনোটিই নয়, হয়তো আদর্শবাদ সমস্যা এড়াবার উপায় বা শেষ অস্ত্র। এ বিষয়ে কবির প্রতিক্রিয়া যেমন পূর্বে লক্ষ্য করেছি—দ্বিমুখী ঃ হয় অনুকম্পা, নয় ভৎর্সনা। উত্তেজিত আবেগ ও ধিক্কার বারংবার প্রশমিত হয়েছে নীচু সুরে। প্রকৃতি ও মহামানব—সমাধানের এই দুটি রীতির মধ্যে প্রথমটি তাঁর স্বভাব সংস্কারের অনুগামী, দ্বিতীয়টিকে তিনি সম্পূর্ণ নিজের করে নিতে পারেন নি। প্রথমটিতে তাঁর অভিজ্ঞতার স্বরূপ ও সহজ সুর, প্রকৃতি আজও তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টিতে "সত্যের আনন্দরূপের" অধরা বাণী বহন করে, ক্লান্ত কবিচিত্তকে করে নিরাময়, তর্ক বা সমস্যার সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ
(শেষ সপ্তক, পৃঃ ২৩)

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্র পাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়।
বিলের জলে বাঁধ বেধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।
গাংচিল উড়ে বেড়াচ্ছে
মাছধরা জালের উপরকার আকাশে।

মাছরাঙা স্তব্ধ বসে আছে বাঁশের খোটায়
তার স্থির ছায়া নিস্তরঙ্গ জলে।
ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধ গন্ধ।
(ঐ, পৃঃ ৮—৯)

তোমরা এসেছ তর্ক নিয়ে।
আজ দিনান্তের এই পড়ন্ত রোদদুরে
সময় পেয়েছি একটুখানি।.....
দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই—
আছে বনের সবুজ,
জলের ঝিকিমিকি—
জীবন স্রোতের উপর তলে
অল্প একটু কাঁপন, একটু কল্লোল,
একটু ঢেউ.....
(শ্যামলী, পৃঃ ২৭)

দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ মহামানব আবির্ভাবে তিনি বিশ্বাস করেন বটে বিশ্বজোড়া আবর্তে তাঁরাই জীবনের ধ্রুবতারা, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে একটু আপোষরফার ভাব আছে যেন। সভ্যতার সংকটে তাঁর মহৎ বেদনার ভাষা বিস্মৃত হবার নয়··· "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ"। সুতরাং···মহামানবে বিশ্বাস করা ছাড়া কি উপায়? ব্যাপারটিকে হয় তো সরল করে দেখানো হোলো, কি একথা সত্য যে এই বিশ্বাসের কেন্দ্রে ভারতীয় মন যে সম্যক দৃষ্টি ও সমতা প্রত্যাশা করে উত্তর কাব্যের অনুকম্পা ও ভৎর্সনার দোলায় তার সন্ধান খুব বেশি নেই। তা ছাড়া এ ব্যাপারে তাঁকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অপেক্ষা অপর জনের—যদিও মহাজনদের —শরণাপন্ন হতে হয়েছে। অথচ—যেমন পূর্বের উদ্ধৃতি থেকে লক্ষ্য করতে পারি— প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলিতে সংকটের কোনো ছায়াই পড়েনি, এবং যেখানে পড়েওছে কবির কণ্ঠস্বর অনেক বেশি স্বাভাবিক ও নিজস্ব ঃ

আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন—
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন।
(নবজাতক পৃঃ ৩৯)

যেআমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার
সে-আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায়
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

(সেঁজুতি, পৃঃ ২৪)

এ কথা সবাই জানে
যে সংগীত রস পানে
প্রভাতে প্রভাতে
আনন্দে আলোক সভা মাতে
সে যে হেয়,
সে যে অশ্রদ্ধেয়,
প্রমাণ করিতে তাহা আরো দীর্ঘকাল যাবে
এই একভাবে।
বনের পাখিরা ততদিন
সংশয় বিহীন
চিরন্তন বসন্তের স্তবে
আকাশ করিবে পূর্ণ
আপনার আনন্দিত রবে।

(রোগশয্যায়, নং ৩১)

শিল্প বা জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিবেশ বা ইতিহাসের কার্যকারণ সম্বন্ধ অতি সূক্ষ্ম ও জটিল। রবীন্দ্রনাথের "পলাতক" কবিকল্পনা ও প্রকৃতিদর্শনের মূল সূত্রের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা স্থগিত রেখে, প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশ দশকের ইংরেজ যুবকবিদের তুলনা করলে কয়েকটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়। এঁরা সকলেই, যেমন ভার্জিনিয়া উলফ্ বলেছিলেন, এক এলিয়ে পড়া দুর্গের বাসিন্দা। পিতৃ-পুরুষের সঞ্চিত ধনসম্পদ, বনেদি শিক্ষা, মধ্যবিত্ত পরিবারের সংস্কার, মনুষ্যত্বের দাবী ও সুবিচার প্রার্থী বিশৃঙ্খল জগতের সচেতনতা—এই সব নিয়ে সেই দুর্গ। দুর্গবাসীদের মনমেজাজ যে কি ধরনের হবে অনুমান করা কঠিন নয়। প্রথম, অনিশ্চয়তার দুর্ভোগ, তা থেকে আত্মগ্লানি, আর অতি সহজেই আত্মগ্লানি ভোল

বদলায় আক্রোশের মুখোস পরে—যারা এই সমাজ গড়েছে, তাকে জিইয়ে রেখেছে, আক্রোশ সেই সমাজ শিরোমণিদের বিরুদ্ধে। অথচ—এও আর একটি দিক—যে-সমাজব্যবস্থার সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করা যাচ্ছে তার পুরোপুরি নিন্দাই বা কি করে সম্ভব? আক্রোশ, আত্মগ্লানি, অপরকে দোষী সাব্যস্ত করা—এই থেকেই বোঝা যাবে বুর্জোয়া সমাজের উপর তাদের আক্রমণের হেতু ও ব্যর্থতা। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই যুবকবিদের মিলের চেয়ে অমিলের অংশই বেশী। তার একটি বড় কারণ যে এঁরা লালিত হয়েছেন ভিন্ন পরিবেশে, কাজেই এঁদের বিশ্ববোধ যে বিপরীত হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকাল কেটেছে ভিক্টোরিয় ঔপনিবেশিক বিস্তৃতির যুগে, অভিজাত পরিবেশে, জাতীয় উন্মেষের প্রথম প্রভাতে। অপ্রীতিকর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সনাতনী সুরে আদর্শবাদী সান্ত্বনা ও সমালোচনা দু'য়ের কোনোটিই অসম্ভব ছিল না সে যুগে, এমনকি অনেক সময়ে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদও ইতিবাচক ঠেকেছে। জীবনের শেষ ভাগে, সত্য বলতে শেষ দলকে, "রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের", নরঘাতী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার মুখোমুখি হয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রচীন প্রত্যয় ও বিশ্লেষণকে বাদ দিতে, অন্তত পক্ষে যাচাই করতে বাধ্য হলেন। এবং এর ফলেই মানবমহিমার এক বিচিত্র, উজ্জীবিত সংজ্ঞা লাভ করলেন শরশয্যাহত আদর্শপন্থী কবি। অথচ এই "পালাবদলের" জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন বলে মনে হয় না। অত্যুক্তি ও আক্রোশের অন্যতম কারণ হয়তো তাই। অতীতের দিনগুলি ছিল অন্যজগতের—"সেখানে পদ্মার বিস্তীর্ণ তীর, অন্যপাড়ে বাঁশবন, আমবন, পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে, গুঁড়ি-মোটা কাঁঠালগাছ,—পুকুরের ধারে শর্ষেখেত, পথের ধারে বেতের জঙ্গল, দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত, তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছে দিনরাত মর্মরধ্বনি···বিশুদ্ধ তার আভিজাত্যিক ছন্দ"—শিলাইদহের কাছারিবাড়ি, বিশ্বপর্যটন, ভক্তবৃন্দের স্তুতি-অর্ঘ্য, বিমুগ্ধ বিশ্বের অভিনন্দন, নবপ্রভাতের অরুণিমা, বিশ্বভারতী। অন্যদিকে, এই যুবকবিদের দিন কেটেছে দেশে-বিদেশে অসহ্য অন্যায় ও নারকীয় বিভীষিকার রাজ্যে, শান্তম্ শিবম্ সুন্দরম স্মরণ করে তৃপ্ত থাকার অবসর তাঁদের নেই, প্রশান্ত চিত্তে স্মরণ করা তো দূরের কথা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বহির্জগতের বিক্ষোভের ভারে পীড়িত নন, সমাজসত্তার দাবী যখন স্তিমিত, তখনই "আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়" কয়েকটি আশ্চর্য কবিতার আবির্ভাব হতে দেখি। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে এ শ্রেণীর লেখা দুর্লভ। কিন্তু এদের যে কোনো বিশেষ 'সামাজিক' তাৎপর্য আছে তা মনে হয় না। কোনো

বিশেষ সামাজিক পরিবেশে এদের উদ্ভব সম্ভব হলেও এদের নিজস্ব একটি ভাবজগৎ আছে, "প্রলয়তোরণ চূড়া"য় নিঃসঙ্গ ব্যক্তিচেতনার সেই প্রান্তিক জগৎ। কাজেই এর যদি কোনো তাৎপর্য থাকে সে হয় তো তাত্ত্বিক। কিন্তু দূরত্ববোধ এখানেও, বলতে পারেন এখানে তিনি পাঠকদের পিছনে ফেলে নিজের সঙ্গে, নিয়তির সঙ্গে বোঝাপড়ায় ব্যস্ত, সংগ্রামরত ঃ "অকস্মাৎ মহা-একা ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণ চূড়া হতে" (প্রান্তিক, নং ৩)। কবির পূর্ব রচনার অনুরাগী পাঠক এই লালিত্য-বর্জিত 'কঠিন' কবিতার সামনে অস্থির ও অসুখী বোধ করতে পারেন, এদের উপভোগ ও বিচারে তাদের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। যখন রবীন্দ্রনাথ নিজকে ঋজু, রিক্তপ্রকাশের মহিমা দিলেন, তখন, শেষের সে-দিন ভয়ংকর, খুব অল্প লোকেই সেই "রৌদ্রী রাগিনীর দীক্ষা"র জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অথচ এই সারাৎসার কাব্যে জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন রবীন্দ্রকবি, এই তাঁর শেষ শিখা ও শিখর।

> Richer entanglements, enthralments far
> Mere self-destroying, leading by degrees
> To the chief intensity.

এখনকার কাব্যের ভাষা যতই সরল হোক না কেন—বুদ্ধদেব বসু একে কোথায় যেন 'বেসিক্ বেংগলি' বলে বর্ণনা করেছেন—অধিকাংশ পাঠক এদের গ্রহণ করেন নি। তাঁদের দুর্ভাগ্য! রবীন্দ্রকবির এই 'শেষ আহ্বান' চিনে নেবেন এমন পাঠক সংখ্যাগুণতিতে কম, একে নিজের করে নেবেন তাঁদের সংখ্যা বোধকরি আরও অল্প। অথচ এই সেই "গোপন রাত্রি" (শেষ লেখা, নং ১৪) যার সূচনা 'প্রভাত সঙ্গীতে'। "দুঃখের আঁধার রাত্রে" কী গান গেয়েছে পাখি! মনে রাখা ভাল, এই শেষ লেখা, ইংরেজিতে যাকে "essential poetry" বলতে পারি, ট্র্যাজিক হতে বাধ্য।

কবির অভিজ্ঞতার অসাধারণত্বই কি শেষ লেখার অস্বীকৃতির প্রধান কারণ? চেতনার যে-ঘূর্ণিলোকে এদের আশ্রয়, এবং যে-অধ্যাত্মবোধে তার বিচার ও উপলব্ধি সম্ভব তা দাবী করবেন ক'জন বা কারা? যে নিরন্তর দহন ও আত্মহোমানলে রবীন্দ্র-নাথের কাব্য ও জীবনদর্শন কখনও বা সংসার বিমুখতা—'খাঁটি' হয়ে উঠেছে, সেখানে প্রচলিত কাব্য মীমাংসা, আত্মরতি বা অকারণ পুলক যথেষ্ট নয়। উত্তরকাব্যকে জড়িয়ে আছে সত্যানৃতের মিথুন, আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব। আজ তার চূড়ান্ত পরীক্ষা ঃ "সে আঁধার আলোর অধিক"। আজ বুঝি কোনো মনগড়া ঐক্য বা সমন্বয়সূত্রই যথেষ্ট নয়,—অহং ও বিশ্ব, বিষয় ও বিষয়ী, এই দুটি তত্ত্বের একটি অপরকে গ্রাস বা নিরস্ত না করে ক্ষান্ত হবার নয়। তবে তাই হোক ঃ

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়...
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়
পায় যেন অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার...

কবি সমস্ত প্রশ্ন ও পরীক্ষার শেষে "অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা"য় জেগে থাকে এক মহাশূন্যতা। নব উন্মেষের উপকূলে—"রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম"—কবি ও কাব্য দুইই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে এক অজ্ঞেয় দিগন্তে, কোন অনির্দেশ্য অসীমে! নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে ঃ তারপর? "মেলেনি উত্তর"।

শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে
পরমের সুরে চরমের গীতিকলা।...
চির-প্রশ্নের বেদী সম্মুখে চির নির্বাক রহে
বিরাট নিরুত্তর।

(সেঁজুতি, পৃঃ ৮)

আর উত্তর, বা যোগাযোগের সূত্র যদি থেকেও থাকে, সে এতই সূক্ষ্ম যে তাকে অনুভব করা গেলেও তার ব্যাখ্যা চলে না। আর সে-কাজ বোধ করি কবিদের দ্বারাই হওয়া সম্ভব, সেখানে সমালোচকের অনধিকার চর্চা না করাই ভাল। "কত যে রহস্যবাণী—কত যে কাব্য, কবির কাছেই যারা বলে তাদের মর্মকথা"। (ঋগ্বেদ, ৪, ৩, ১৬)।

এই সমস্ত পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কাব্যরীতির, ভাষার, ছন্দের, উপমার নিশ্চিত ও নিয়ত রূপান্তর সাধিত হয়ে চলেছে। এর আপাতসরলতায় ভুললে চলবে না। সরলতার পিছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম, দৃষ্টির ও ভাষার নিত্য শুদ্ধীকরণ। সেই সংগ্রাম ও শুদ্ধীকরণ—"যাহারে অন্তরতম হৃদয়ের অদৃশ্য আলোকে দেখা যায় ধ্যানাবিষ্ট চোখে"—বাদ দিয়ে এর স্বরূপ বোঝা যাবে না।

দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে...

(শেষ লেখা, নং ৭)

রীতি ও বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে দেখতে গেলে শেষের, বিষয় করে শেষের দু'বছরের কবিতাগুলির সম্পর্কে যা চোখে পড়ে তা হোলো কাব্যিকতা বর্জন, এতই স্বচ্ছ, বিরল এ-কবিতা যে একে, বাইরে থেকে, কাব্য বলেই মনে হয় না,

এলিয়টের ভাষায় বলতে পারি, "the poetry does not matter"[১২]। "প্রৌঢ় ঋতুর ফসল" এরা, তাই এদের মধ্যে পাওয়া যাবে না ছন্দের সেই পরিচিত দোলা, সুরঝংকারের সাবলীল নৈপুণ্য, সেই "বরবর্ণিনী" কাব্য (শেষ সপ্তক, পৃঃ ৪৬) যা দীর্ঘকাল রবীন্দ্রানুরাগীকে বিমুগ্ধ করে রেখেছিল। প্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গি (ও রীতির) দিক দিয়ে কবির শেষ দু'বছরের লেখা, অমিয় চক্রবর্তীর মতে, একেবারে নতুন জাতের, রবীন্দ্রনাথের পূর্বরচনার সঙ্গে তাদের পার্থক্য স্পষ্ট। এই সাংকেতিক কবিতাগুলি বেশির ভাগ সময়ই আয়তনে ছোট, নিরাভরণ, অসম পঙক্তির সমাবেশ। বক্তব্যে এই নিষ্করুণ স্পষ্টবাদিতা কতকটা লরেন্স-বর্ণিত আধুনিক কাব্যের সংজ্ঞার কাছাকাছি। সান্ধ্যভাষার সদৃশ এই "বাণী পিণ্ড" (শেষ লেখা, নং ৯), এর ধ্বনি, বাক্য যোজনা ও উপমার পিছনে আত্মগোপন করে আছে "রহস্যে রহস্যময়" এক আশ্চর্য কবিকাহিনী ঃ

যুগ যুগান্তরের ভগ্নশেষের ভিত্তিচ্ছায়ার
ছায়ামূর্তি বাজিয়ে তুলেছে রুদ্রবীণায়
পুরাণখ্যাত কালের কোন নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা।

(শেষ সপ্তক, পৃঃ ৩০)

কিন্তু এই লেখাগুলির মধ্যেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে অন্তরঙ্গ গভীর সুরে গভীর কথা বলেছেন। সম্পূর্ণ হয়নি সে আলাপ, সে আত্ম-উন্মোচন, কিন্তু বোধহয় তার ইসারাতেই রবীন্দ্রকবির রূপায়ণ ও পুনর্বিচার করা চলে। সে রূপায়ন এতই নূতন যে তা রবীন্দ্রনাথের নিবিড়তম আবেগ ও অন্বেষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সে কথা অনেকে বুঝতে চাননা। চিন্তায় বা প্রকাশকর্মে আজ কোনো বাহ্য রীতির দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন,—"সব চিহ্ন মোছা অসজ্জিত" (প্রান্তিক, নং ৪) এই উত্তরকাব্য। শেষ পর্যন্ত যে একমাত্র রীতি তাঁর সাহচর্য ও অনুগমন করেছে সে হোলো ঔপনিষদিক। কয়েকটি ছোট কবিতা—যেমন "আরোগ্য," নং ১, "রোগ-শয্যায়," নং ২৫ ও ৩৬—সেই প্রাচীন রত্নসম্ভার থেকে দু একটি বাণীবিন্দুকে আশ্রয় করে স্বল্পতম বিবৃতি ও ব্যাখ্যানের সাহায্যে কাব্যরচনা সমাধা করেছে। এ যেন আধুনিক বাংলায় প্রাচীন শ্লোক ও সূত্রের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত ও টীকা—ঠিক

---

[১২] অথবা বলা যেতে পারে এখানে কবির চেষ্টা হোলো

"to get beyond poetry, as Beethoven, in his later works, strove to get 'beyond music."

যেমন তাঁর সমগ্র জীবনরচনা সেই প্রাচীন পথ ও প্রজ্ঞার যুগোপযোগী টীকা ও অন্বয়। উপনিষদ আজ আর 'প্রভাব' নয়। সেই পুরাতন মন্ত্রের পুনরাবৃত্তির কথা ওঠে না, নিঃসন্দেহে সত্য ও মহৎ তারা, কিন্তু ভিন্নকালের ভূমিকায় নয়। প্রাচীন সত্য নবীন কবির কণ্ঠে তখনই সত্য হয়ে ওঠে যখন ভিন্ন পরিবেশে তার নূতন উপলব্ধি ও সার্থক নবায়ন ঘটবে। যেহেতু কাব্যের এই মহত্তম সার্থকতাকে আমরা স্বীকার করি তাই উত্তরকাব্যের এই দিকটির উপর আমরা বিশেষ জোর দিতে বাধ্য হয়েছি। প্রধানতঃ গীতিকবি হওয়া সত্ত্বেও—এবং জ্ঞান ও তপোধর্মী না হওয়া সত্ত্বেও—স্বভাবের তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ আদি কবিদের জগতে প্রবেশ করেছেন, সেই আদিকাব্যের সঙ্গে উত্তরকাব্যের এই ক্ষুদ্র ও মহত্ত্বপূর্ণ অংশের স্বাজাত্য স্বীকার না করে উপায় নেই। বৈধ মার্গে বা অন্য কোন পথে[১৩], যেভাবে বা যতদূরই তিনি গিয়ে থাকুন না কেন, সে প্রশ্ন ভিন্ন। তাঁর নিজের ভাষাতেই তিনি সেই আর্য পিতৃপুরুষদের পথের পথিক, ভারত পথিক। যদিও তাঁদের অনুরূপ ঋদ্ধি ও গাম্ভীর্য এই তরুণতম কবির ভাব ও ভাষায় পাওয়া যাবে না, হয়তো থাকা সম্ভব নয়। এ হোলো হঠাৎ আলোর ঝলকানি, নেই সেই স্থির বিদ্যুৎসম জ্যোতিঃ। শুধু এই কারণেই যে একজন আধুনিক কবি সমসাময়িকতার দুরধিগম্য বাধাবিপত্তি ভেদ করে খণ্ডকাব্যের মাধ্যমে মানব-চেতনার প্রথম প্রত্যুষের, মন্ত্রকাব্যের দিকে চলেছেন, সেই পথে তার "অসমাপ্ত পরিচয়ের" নির্দেশ রেখে গেছেন, কী ভাবে তাঁর শেষ লেখা "বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া-আলোয়" সেই সর্বোত্তম আবিষ্কারের দিকে ফিরেছে, জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতির আদিনির্ঝরিণী তটে—যারা ঘুমিয়ে নেই তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা যোগ্যতর প্রমাণের অপেক্ষা করে না। এই সেই স্থির কেন্দ্র, সেই শাশ্বত লক্ষ্য যার কাছে অন্য সব কিছু অবান্তর।

মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।

(আরোগ্য, নং ৩)

---

১৩ তোমার জ্ঞানী আমায় বলে তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে, ফিরে যারে।"

এই লেখাগুলিকে শুষ্ক বা নিষ্প্রাণ বলতে দ্বিধা হয়, যদিও অনেকে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এ হোলো কাব্যের কাব্য, রসের রস, "Poetry so transparent that we should not see the poetry"। এদের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে প্রমাণ করলেন যে তিনি "সৃষ্টির সীমান্ত জ্যোতির্লোকবাসী" (প্রান্তিক, নং ১০), চেতনার, অধরার দূতী, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, অতীত-অনাগতের সেতুস্বরূপ। কিন্তু এটিও যত মূল্যবান হোক না কেন, রবীন্দ্রকাব্যের একটি দিক, একমাত্র নয়। আমাদের বিচারগত পক্ষপাত যে এইদিকে সেকথা অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভা এত ব্যাপক ও বহুচারী, দ্রুত ও খেয়ালী, আত্মবিরোধের মূল এত গভীর ও বিস্তৃত, এই কবি সত্তায় সচেতন প্রয়াসের অংশ এতই অল্প যে কোনো একটি তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সেই বিচিত্রার হদিস পাওয়া অসম্ভব। যেমন ধর্মসাধনায় তেমনই কাব্যসাধনায় তিনি আমাদের অদ্বিতীয় eclectic। সেই কারণেই কি তিনি সমন্বয়ের সন্ধান ও ইঙ্গিত দিয়েছেন, সিদ্ধ হন নি? তাই কি

অকথিত বাণীপুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকাসম?
(আরোগ্য, নং ২৫)

তবুও, বিশ্বাস রাখা ভাল, অভিজ্ঞতার বা রসবিচারের এমন কোনো উদার মত বা দৃষ্টিকোণ নিশ্চয়ই আছে যার দ্বারা এই বিচিত্রার যথাযথ বিচার ও সাধুসম্মত উপভোগ চলতে পারে, যাতে করে নানা সমাহারে গঠিত এই কাব্য ও কবিমানসের মর্মবাণী উদ্ঘাটন করা সম্ভব হতে পারে [১৪]। কিন্তু সেকাজ কি সত্যই সম্ভব? কবি-কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করে ক'জন বলতে পারেন?

প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের মত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারেনি বিদ্রূপ করিবারে?
(নবজাতক)

---

[১৪] ...মহৎ রচনার মধ্যে একটি বিশেষ মত, একটি ক্ষুদ্র ঐক্য বের করা দায়; আমরা ক্ষুদ্র সমালোচকেরা নিজের ঘর-গড়া মত দিয়ে যদি তাকে ঘিরতে চেষ্টা করি তা হলে পদে পদে তার মধ্যে স্বতোবিরোধ বেধে যায়। কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্গম কেন্দ্রস্থানে তার একটি বৃহৎ মীমাংসা বিরাজ করছে, সেটি হচ্ছে লেখকের মর্মস্থানে, অধিকাংশ স্থলেই লেখকের নিজের পক্ষেও সেটি অনাবিষ্কৃত রাজ্য।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সাহিত্যের পথে", পৃঃ ১৬৮।

তার চেয়ে অনেক সহজ ও স্বাভাবিক এই প্রশ্ন করাঃ

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে ?
(শেষ সপ্তক, পৃঃ ১২—৩)

রবীন্দ্রনাথের "সমস্ত পরিচয়" নেবার উদ্দেশে একটি সামগ্রিক দৃষ্টির আভাস আমরা এখানে-ওখানে দিয়েছি। কিন্তু সেইটিই যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ এমন কথা বলার দুঃসাহস আমাদের নেই। অন্যান্য মহৎ সাহিত্যের মতই রবীন্দ্রকাব্যেও পাঠককে সবই নূতন করে নিতে, প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে চলতে হবে, তাঁর জানা আছে যে তিনি অনুভবকে আরও অগ্রসর, আরও গভীর ব্যঞ্জনায় ভরে নিতে পারেন। সে দিক দিয়ে এক একটি বিশেষ শিল্পসৃষ্টি তাঁর কাছে অক্ষয়, অনিঃশেষ। অন্তত একজন পাঠকের—প্রায় বিশ বছর কাল—তাই মনে হয়েছে। আমার রবীন্দ্র-পরিক্রমা যে "মনের মাধুরী মিশায়ে" সেকথা লেখকের অজানা নয়, রবীন্দ্রকাব্যরহস্য ভেদ করার জন্য আমি রবীন্দ্রকাব্যেরই শরণাপন্ন হয়েছি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যই তার প্রেরণা ও উৎস, তার বাইরে যদি কিছু দেখে থাকি, রবীন্দ্রকাব্যই আমাকে তার সন্ধান দিয়েছে।

আমাদের এ-আলোচনায় সমাধানের চাইতে সমস্যার অংশই হয়তো বেশি, বিশ্লেষণের চাইতে বক্রোক্তি। তার জন্য আমি লজ্জিত নই। এক্ষেত্রেও চিরচঞ্চল, আত্মজিজ্ঞাসু কবিকেই আমার আদর্শ মেনেছি। শেষ কথা বলতে যাঁর এত কুণ্ঠা, যাঁর "হারিয়ে যাবার নেই মানা মনে মনে" সেই কবির জয়-পরাজয়, সাফল্য-অসাফল্যের "পরীক্ষাচিহ্নিত তালিকা" পেশ করতে দ্বিধা হওয়া অপরাধের নয়। তাছাড়া, আমাদের বরাবরই উদ্দেশ্য ছিল অনুসন্ধানের, রায় বা নিদান দেবার নয়। নতুন নিরিখের দায় থেকে নিস্তার নেই, তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু কাল। তত্ত্বকথা বলার অনুমতি পেলে বলতে পারি, বিশ্ববিসৃষ্টি একাধারে সমগ্র ও বিচিত্র। রবীন্দ্রকাব্যে সেই সমগ্র ও বিচিত্রকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে পারা সমালোচকের কর্তব্য ও লক্ষণ।

সমালোচনা কবির মূল অভিজ্ঞতায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম, এবং বোধকরি ইম্‌প্রেস্‌নিষ্টিক্ সমালোচক ছাড়া কেউ সে-চেষ্টাও করেন না। সমালোচনার আসল দায় বা কর্তব্য আলাদা, রূপ দেহের, রচনার মূল্যবিচার, তাই তার প্রধান করনীয়। বিচারের ধারা ঠিকমত অনুসৃত হয়ে থাকলে, প্রকারান্তরে বা ইঙ্গিতে, বিশ্লেষণের সাহায্যে বা অন্য কোনো উপায়ে, মূল অভিজ্ঞতাটিকে সে পাঠকের কাছে এনে দিতে পারে। অবশ্য, আবার বলি, বর্তমান আলোচনা বিশদ নয়, বরং প্রাথমিক। এই প্রবন্ধে বা উপসংহারে রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা অবসান হতে পারে এমন ভ্রান্ত ধারণা আমার নেই। যে-কোনো সময়ে এই আলোচনার ধারা ধরে এক বা একাধিক আলোচনা—সপক্ষে বা বিপক্ষে—অনায়াসে আরম্ভ করা যেতে পারে। তা যদি কোনো দিন হয়, এ-লেখার ফলে একজন রবীন্দ্রপাঠকের মনেও যদি প্রশ্ন ও অনুসন্ধিৎসা জাগে, রবীন্দ্রপ্রতিভার কোনো একটি দিক খুলে যায় তাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত লেখার অধিকাংশই—যে কথা আমরা আগেও বলেছি—মহৎ কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় নি। তাদের কথা বাদ দিলেও যে লেখাগুলির সার্থক প্রকাশ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই তারাও যেন সামাজিক মানস, তার চাহিদা ও হিসাব নিকাশের বাইরে। সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে এই আত্মকেন্দ্রিক কাব্য ও নাটকের যোগ কোথায়? ভাবজগতের এই প্রকাশ ও প্রয়োজনে আগামী কাল কি মর্যাদা দেবে বলা কঠিন। আধুনিক শিল্পের অন্যান্য বিভাবের মত এই অতিমাত্রায় ব্যক্তিগত, "জীবন স্রোতের উপরতলা" হতে লেখা সর্বজনীন অভিজ্ঞতা, "জীবনের ঘোলাস্রোত" হতে এত বিচ্ছিন্ন যে তাদের দাবী করা তো দূরের কথা, পরম ঔদাসীন্যে সমাজ তাদের অগ্রাহ্য করে থাকে, অভিযোগ তোলে তাদের দুর্বোধ্যতা ও নিরর্থকতা নিয়ে। এ-অভিযোগ বহুবার শোনা গিয়ে থাকলেও মৌলিক শিল্পবস্তুর সততা ও সত্যতা সন্দেহ করা চলে না। এ-জাতীয় নব্য রীতি স্বীকার পাবার পক্ষে সাধারণতঃ কয়েক দশকের বা দু'এক পুরুষের ব্যবধান দরকার। উত্তরকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি একদিন সাধারণ পাঠকের উপভোগ ও আয়ত্তের মধ্যে আসবে, আসা উচিত, "ঘুচবে তোমার নির্বাসনের ব্যথা" এই বিশ্বাস নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসেছিলাম। ভবিষ্যতে সে বিশ্বাস অপ্রমাণিত হলেও কিছু এসে যাবে না, কেন না যোগ্যতমের উদ্বর্তন জীবলীলার ক্ষেত্রে যদি বা সত্য হয় শিল্প-সাহিত্যের বেলায় তার ব্যতিক্রম হামেশাই চোখে পড়ে।

যতদিন না পাঠক সমাজ কবির "নিঃসঙ্গ মনের" প্রেরণাকে—

রাস্তার এপারে আমি নিঃশব্দ দুপুরে
জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দূরে
জীবনের তত্ত্ব যত খুঁজি
নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি
সারাদিন চলেছে সন্ধান
দুরূহের ব্যর্থ সমাধান।
(নবজাতক, এপারে ওপারে)

রবীন্দ্রশিল্পের হৃৎপুরুষ, "অপ্রয়োজনের মানুষকে" স্বীকার করে নিচ্ছেন—এবং তার জন্যে সময় লাগবে বলে মনে হয়—রবীন্দ্রপ্রতিভার ব্যবধান, দূরত্বের অপবাদ ঘুচবে না। বিদেশী কবি-সমালোচক স্পেণ্ডারের ভাষায় বলতে গেলে, আধুনিক সাহিত্যের অন্যান্য দিক্‌পালদের মতই, রবীন্দ্রনাথও আত্মনির্ভর সৃজনীমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে বিরাজ করবেন। সমাজের কাছে কোনো আনুগত্য নেই তার[১৫], সে "এড়িয়ে চলার ছন্দ", ধূলির থেকে পালিয়ে যাবার সৃষ্টি ছাড়া ঠাঁই"। তাই কি তাঁর কাব্যে ধরা দিয়েছে "শুধু আপনার নিভৃত রূপ ছায়ায় পরিকীর্ণ"?

দলের উপেক্ষিত আমি
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সাথী।
(পত্রপুট, পৃ ৫৩)

---

১৫ যখন বালক ছিলেম ছিল না কেউ সাথী
দিন কেটেছে একা একা
চেয়ে চেয়ে দূরের দিকে।
জন্মেছিলাম অনাদৃত সংসারে
চিহ্ন-মোছা প্রাচীরহারা।

সেই কারণেই কি "দলের উপেক্ষিত" কবি শেষ পর্যন্ত "সুদূরতার সম্মানে" "লোকালয়ের বাইরে নির্জনের সাথী" হয়ে রইলেন?

রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম আবেগ, কবিধর্ম যেভাবে পুষ্টিলাভ করেছে, যেভাবে কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে তা চিরাচরিতের অনুসরণ বা তপস্যালব্ধ বোধির সাহায্যে নয়। তার প্রধান উপাদান ও উপজীব্য একটি অত্যাশ্চর্য অতি-সূক্ষ্ম মেজাজঃ "জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে-বাঁধা মন দিয়ে" (আকাশ প্রদীপ, পৃঃ ১০)। সেই সূক্ষ্মতা সাধারণ কাব্যপাঠকের নাগালের মধ্যে কিনা সন্দেহ করার অবকাশ আছে। বিনা বিচারে রুচি ও প্রকৃতির স্বাজাত্য মেনে নেওয়ার হেতু নেই। যে রবীন্দ্রমানস দ্রুত বিসর্পিনী দৃষ্টির সাহায্যে অনায়াসে কাল হতে কালাতীতে, "পৃথিবীর কোনো প্রতিবেশী গ্রহে "চলে যায়, যে-কবি" "সূক্ষ্ম সম্বন্ধের জাল প্রসারিছে নিত্যই আকাশে, মাটিতে বাতাসে", মানব-সভ্যতা ও ইতিহাসের ধারাকে যিনি দেখেছেন মহাশূন্যের ভূমিকায় চিত্রলেখার মত, শূন্যতা যাঁর কাছে শান্তিরই নামান্তর, সেই "গর-ঠিকানার পথিক" লোকায়তের বাইরে। তাকে নাকচ করা সহজ, গ্রহণ করা কঠিন। সেই কঠিনকেই বরণ করে নেবেন রবীন্দ্ররসিক, তাই হবে তাঁর পরীক্ষা ও পুরস্কার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিজের মত বা অধিকার করে নেবার জন্যে প্রয়োজন হবে তাঁকে অতিক্রম করার, শুধু সাহিত্যে নয়, জীবনে ও "কর্মে ও কথায়" ঃ জীবনে জীবনে যোগ করা না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা"। সে কাজ কবে, কি ভাবে হবে বলা কঠিন। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে রবীন্দ্র প্রতিভার—পরিচয় বা মূল্য বিচারে কোনো স্থায়িত্ব বা নিশ্চয়তা দেখা যাবে না। তিনি 'কোটারি'র কবি হতে পারেন, 'ক্ল্যাসিক' হবেন না। উত্তরকাব্যে তাঁর অতি-সরল বিবৃতি ও মূর্চ্ছনা সহজে ভোলবার নয়। তা ছাড়া এর মধ্যে রয়েছে একটি রহস্যাবৃত নাটক, সংকটের তীব্র সংবেগ ও মন্থন, রবীন্দ্রকাব্য ও মানসের "মাধুর্য যুগের ভগ্নস্তূপ"। আধুনিক (কথাটি অবশ্য আপেক্ষিক) কাব্যকলা ও মানসের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি এতে হয়তো নেই, কিন্তু যা আছে তার ইঙ্গিতেই রবীন্দ্রকাব্য ও এ-যুগের কাব্যমানসের পার্থক্য বোঝা সহজ হবে।

বিশুদ্ধ আঙ্গিক ও কাব্যবিচারে চোখে পড়ে এর ভাষার অভিনবত্ব যার ফলে এর সরলতম বিবৃতিই গভীরতম উপলব্ধির যোগ্য বাহন। লালিত্যের শেষ রেখাটুকুও মুছে গেছে।

আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন ছন্দ
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখর নির্ঝরিণী।
(পত্রপুট, পৃঃ ৩৭)

ভাষা কোনো দিনই তাঁর বৈরী হয়নি—যদিও কবির মাঝে মাঝে আশংকা হয়েছে—বরং এই নব্য রীতির ইসারা ভবিষ্যতের, পূর্ণতার দিকে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কোনো কবি প্রাক্তনীর "চিতাভস্মশয্যা তলে নিরাসক্ত মনে নব-সৃষ্টি-ধ্যানের আসনে" স্থান নেবেন কে বলবে। আত্ম-সচেতন, বহুলমাত্রায় খেয়ালী গদ্যকবিতা ও স্মৃতিবহ ক্লান্ত রচনার অপেক্ষা এই শেষ লেখাগুলির মধ্যে তিনি অনেক বেশি, মালার্মে-অনুমোদিত, কবিকর্তব্য পালন করেছেন, ভাষার শুদ্ধীকরণ ঘটিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক কবিকুল—র‍্যাঁবো, মালার্মে, রিলকে, এলিয়ট ও আরও অনেকে—সেটিকে যেভাবে একটি বিশেষ ঢঙ বা কৌশলে পরিণত করতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ততটা নিরঙ্কুশ হওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রমানসে ধ্রুপদী আদর্শের প্রাধান্য[১৬] ও ভাষার শুদ্ধীকরণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে কোনো একটি বিশেষগোষ্ঠী বা ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা বা রবীন্দ্র-ঐতিহ্য বলে কোনো কিছু সৃষ্টি করা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাঁধতে পারে এমন বাঁধন কোথায়? তার প্রয়োজনই বা কোথায়?

আজ কোনো সীমানা দেওয়া নয় আমার মন,
হয়তো তাই ভুল বুঝবে আমাকে।
আগেকার সব চিহ্নগুলো গেছে মুছে,
আমাকে এক করে নিতে পারবে না কোনোখানে
কোনো বাঁধনে বেঁধে।

---

১৬ অবশ্য রোমান্টিক সুরের প্রাধান্য তার চেয়েও বেশি। ইয়েটসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনিও বলতে পারেন: "We were the last romantics—chose for theme Traditional sanctity and loveliness"

নীটশের ভাষায় বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ বিপদের বিপদ, ভয়ানাং ভীষণানাম, তিনি একজন ব্যক্তি। স্বভাবসিদ্ধ রোমান্টিক রীতিতে তিনি অনেক সময়ই নিজেকে ব্রাত্য বলে প্রচার করেছেন (পত্রপুট, নং ১৫) হয়তো তাঁর শক্তি ও দুর্বলতা উভয়ের উৎস সেইখানে। পলাতক কল্পনার[১৭] উদারনীতির, মানবতাবাদের পরীক্ষা, পরিণতি ও পরাভব এই কবির শেষ লেখায়।

রবীন্দ্রনাথের "স্মৃতির বেদনা কিছু, কিছু পরিতাপ, কিছু অপ্রাপ্তির অভিশাপ" তাঁর ব্যক্ত উদ্দেশ্যের চাইতেও তাঁর গোপন ও দুর্বোধ্য বাসনা, "স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠাসা" তাঁর ইতি ও নেতিবাচক সব দিক মিলে তাঁর হৃদি-মনীষা-মনসা অনুধাবন করার কাজটিকে একটি অসামান্য মর্যাদা ও রোমাঞ্চ দিয়েছে: বৈচিত্র্য ও বিরোধের পরম্পরার মধ্য দিয়ে তাঁর তীব্রতা ও সরলতা, আবেগ ও অবসাদের কাল, আর্তি ও করুণা, উদ্বেগ ও প্রত্যয়, ব্যক্তিগত, জাতীয় ও সভ্যতার সংকট,—এ যেন কোনো একজন কবির রচনা নয়, কাব্যেরই আত্মচরিত কথা। আর এই বিচিত্রার মধ্যে কোনো যোগসূত্র না-পাওয়ার ফলেই যেন তিনি স্বয়ং হারানো যোগসূত্র হয়ে উঠেছেন। বঙ্গবাণী ও বঙ্গসংস্কৃতির "চিৎপ্রকর্ষের পুরোধা" তিনি, একাধিক অনাগত সম্ভাবনার দিক খুলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি যা পেরেছেন ও তিনি যা পারেন নি—"জীবন ভূমির আর এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা"—এই দুইয়ে মিলে তাঁর অনিঃশেষ অধিকার। পরবর্তীকালের কবিরা তাঁর কাছ থেকে যতই সরে যান না কেন, 'রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত' হবার চেষ্টা করুন না কেন, যাত্রাপথের শেষে তাঁরা দেখতে পাবেন যে কাব্যকলার ক্রান্তি ও উৎক্রান্তির, চেতনার উন্মেষের এমন খুবই কম সম্ভাবনা রয়েছে যার প্রবর্তনা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে করেন নি, যার ইঙ্গিত তাঁর লেখায় পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথকে আমরা যেভাবে জেনেছি, "জনতার খেলা রচিল যে পুতুলিরে", তিনি তার চেয়ে অন্য কিছু, আরো কিছু।

---

১৭ আকাশকুসুম কুঞ্জবনে
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা যাওয়া করে বারবার।
(সানাই, পৃঃ ৮০)

শেষবারের মত, "সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে", উত্তরকাব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে চোখে পড়বে তাঁর আত্মিক ও সামাজিক উভয়-সংকট, নিবিড়তম অন্তরঙ্গতা ও সদূরতম ছায়াপথ, প্রবক্তার উত্তালতা ও তৃণাদপি বিনয়, বিস্ময়ের বিচিত্র বিন্যাস, কাব্যরীতির অন্তহীন শোধন, সর্বোপরি যখন মনে পড়ে কবির বয়স, আমরা যারা প্রয়োজনবোধে তাঁর সঙ্গে প্রতিকূলতার ব্যর্থ অভিনয় করেছি, সাহিত্য জগতের সেই "সর্বগৃধ্নু চেতনা", সেই ক্রান্তদর্শী প্রতিভার কাছে মাথা নত না করে পারি না। সত্যকারের কবি তিনি, পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতাকে নূতন যুগের উপযোগী করে আগামী কালের দিকে—এগিয়ে দিয়েছেন। নিয়তির বিধানকে হৃদয়রক্তে মুদ্রিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এই তাঁর "বীরভোগ্যা···ক্ষত চিহ্নলাঞ্ছিত" শেষ লেখায়।

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ...

শুধু আপনারই নয়, বোধকরি "মরীচিকার অধিকার নিয়ে হিংসা-কণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে" হতভাগ্য রাষ্ট্রব্যবস্থারও। মহত্ত্ব ও করুণায় পরিপ্লুত তাঁর কাব্যে যথেষ্ট নির্দেশ ব্যক্তি ও সমাজসত্তার ঐক্য, শুভবুদ্ধি ও অভিব্যক্তির আশ্রয় কোথায়, মানব চিত্তের কোন সাধনায়।

এ কথা যখন জানি
মানবচিত্তের সাধনায়
গূঢ় আছে সে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত
তখন বুঝিতে পারি
আপন আত্মায় যারা
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানব সৃষ্টির ;
একমাত্র তারা আছে, আর কেহ নাই.....

(রোগশয্যায়, নং ২৯)

ভবিষ্যতের কবিতা হবে এক নূতন সৃষ্টি ও দৃষ্টি, একাধারে সমাজ ও ব্যক্তিসত্তা, ঈশ্বর ও ইতিহাস, প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির এক অভিনব সমন্বয়ে গঠিত হবে সে, এবং সেই দিনই রবীন্দ্রনাথ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবেন, সর্বপ্রকার দলীয়, ব্যক্তিগত

সমালোচনার ঊর্ধ্বে, তাঁর সত্যস্বরূপে। পূর্ণতার এই প্রৈতি অনাগত যুগ ও কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শেষ আহ্বান-ইঙ্গিত। তাঁর মতো অন্য কোনো কবিই আমাদের স্বাধিকার ও প্রয়োজনবোধকে এভাবে, এতভাবে বিস্তৃত করেন নি, তিনি যা দিয়েছেন এবং তিনি যা দিয়ে যান নি, এই দুইয়ে মিলে আগামী কালের লেখকদের কাছে একটি আশ্বাস, সতর্কবাণী ও নির্বাচনের দায়িত্ব, এক সার্বভৌম কাব্যের দায় রেখে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। আত্ম-উন্মীলনের বিরাট চিরবেদিকায়—"আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে"—রবীন্দ্রকাব্যের শেষ আরতির শিখা যুগে যুগে পথিকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করবে : কে তুমি ?

একথা সত্য যে "চরম ঐশ্বর্য নিয়ে অস্তলগনের" রবীন্দ্রকবির যে-আলেখ্য আমার চোখে পড়েছে তাঁর প্রচলিত মুখচ্ছবির সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুব কম। বিনয়ের সঙ্গে সে কথা নিবেদন করছি। আবিষ্কার ও অভিনিবেশের মাথায় একদেশদর্শিতা বা অতিভাষণ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পরিচয়ের শেষ ক্ষণে দেখি ধরাছোঁয়ার বাইরে, বিশ্লেষণের গণ্ডী এড়িয়ে, ছাড়িয়ে গেছে সেই অতিশয় চিত্রপুরুষ।

সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হ'ল ?
ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে ?
(শেষ সপ্তক, পৃঃ ২৭)

সমালোচনার অন্তে একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে শেষ পর্যন্ত "তরলে কঠিনে" রবীন্দ্রকাব্য রহস্য,—"অপ্রাপনীয়ের সে দীর্ঘনিঃশ্বাস, দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা"—অপাবৃত নয়, অনাবৃতই রইলো। "যারা বলে 'জানি' তারা জানিলো না" (শেষ সপ্তক, পৃঃ ১৯)। রবীন্দ্র-উত্তরকাব্যবিচার করার জন্য "অস্তিত্বের অতল বিষাদ", কবি-প্রকৃতি, ইতিহাস ও মানব অভিব্যক্তির সূত্র ও রসার্থ জানা দরকার, অধরার যতটুকু কবি স্বয়ং ধরতে পেরেছিলেন তার চেয়ে আরও বেশি জানা দরকার। যদিও বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে সেই সর্বজ্ঞতার অভিনয় করতে হয়েছে এখন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। রোমান্টিক কবির ব্যর্থতার হেতু জ্ঞানের অভাব,

অজ্ঞেয়বাদ রোম্যান্টিক কল্পনার শেষ দশা, বিভিন্ন সমালোচক[১৮] এই জাতীয় কথা বলেছেন। অবশ্য জ্ঞান অর্থে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নয়। কবির দ্বারাই কাব্যের ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা দূর হতে পারে। সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ছাড়া সমালোচকের করণীয় আর কি থাকতে পারে? এবার তার বিদায়ের পালা। লোকলোকান্তের পরিক্রমার অন্তে স্বর্গদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে ভার্জিল দান্তেকে বলেছিলেন, এবার আমরা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে আমার দৃষ্টি আর এগোয় না। উত্তরকাব্য পরিক্রমার অন্তে আমরাই বা এ ছাড়া আর কি বলতে পারি যে "পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা ফেলিয়া পশ্চতে" রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখাই শেষ নয়?

এ আমার ভাগ্যরাজ্যে অন্যত্র হোথায় দিগন্তরে
অসংলগ্ন ভিত্তি পরে
করে আছে চুপ
অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষার অসমপূর্ণ রূপ।
(নবজাতক, পৃঃ ৩১–২)

উত্তরকাব্যের অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও আত্মাহুতি—"দেখ দুঃখ-হোমানলে যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি"—আমাদের ও অনাগত যুগের জন্য এক বিচিত্র পরিণামের নির্দেশ করছে। রবীন্দ্রনাথ একাধারে একটি যুগের আরম্ভ ও অবসান। নানা অচেতন-সচেতন, সফল-অসফল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে স্বীয় কাব্যদেহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে উত্তর সাধকের জন্য দধীচির বজ্র সৃষ্টি করে রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। পথের সাথি, নমি বারংবার। কোন সে কবি যাঁর সাধনবীর্য কেবল নিঃসঙ্গ ব্যক্তিপ্রতিভার নয়, সমগ্র জাতির নিগূঢ়তম সত্যসংস্কারকে কাব্যদীপ্তিতে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করবে?

---

১৮ The English poetry of the first quarter of this century with plenty of energy, plenty of creative force, did not know enough" Mathew Arnold 'The Function of Criticism'.

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।...

এখনই সে এখানেই আছে
আমার চৈতন্য সীমা অতিক্রম করি,...
সে আলোকে তার ঘর যে আলো আমার অগোচর...

রূপনারায়ণের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়...

কিন্তু এ জগৎ কী? স্বপ্নভাঙা-চোখে কোন জগৎ ধরা দিলো, বাংলা কবিতা কি সেই অনুসন্ধানে পরাঙ্মুখ হতে পারে? "অস্তসমুদ্রের তীরে এ আলোর দ্বারে রবে মোর জীবনের শেষ নিবেদন"। ভারতীয় মানস ও সংস্কৃতির আদি-মধ্যঅন্ত সেই জ্যোতির্মুখ সংস্কারে চিরবিশ্বাসী, চির প্রয়াসী। ভবিষ্যৎ কাব্যের কাছে এ আশা দুরাশা নয়। আধুনিক কালের অষ্টাবক্র কবিরাও কি সেই পথেরই বামাচারী সাধক নন? উত্তরকাব্যকে ঘিরে রয়েছে অনাগতের, অব্যক্তের হাত-ছানি। "যে-রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে" সে অনাদি রহস্যের যবনিকার পূর্ণ উদ্ঘাটন আজও হয়নি।

এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন-আবরণ,
সম্পূর্ণ যে-আমি
রয়েছে গোপন অগোচর।
(জন্মদিনে, নং ২)

শুধু করি অনুভব
চারদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে।
(ঐ, নং ৫)

যা-কিছু হারালো মোর
সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।
সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন।
সে আমার ভবিষ্যৎ...

(রোগশয্যায়, নং ২২)

এ সব দেখে আমরা এ কথাও বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ যত কবিতা লিখেছেন তার চেয়েও মূল্যবান সেই কবিতা যা তিনি লেখেন নি[১৯]। বঙ্গভারতীর কোন সেবক, "মৃতিকার", কবে কি ভাবে সে-সাধনায় "চরমের কবিত্ব মর্যাদা"র সিদ্ধি লাভ করবেন?—

অস্পষ্ট শিল্পের মায়া...
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
কালের দক্ষিণ হস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে।...
মৃতিকার দেবে আসি মন্ত্র পড়ি
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।

(রোগশয্যায়, নং ৯)

—সে ভবিষ্যদ্বাণী করার দায় অধম সমালোচকের নয়।

নানা বিপর্যয়ের মধ্যে একটি সার কথা। উত্তরকাব্যের নানা অসংগতি ও আত্মবিরোধ বিভিন্ন পাঠককে "চির অচেনা" রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন বিভাব দেখাবে। এর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি যেমন আনন্দ দেবে তেমনই আবার অবাক করবে। হয়তো এই কাব্যের প্রাণপুরুষের রহস্য সেই খানে:

---

১৯ দ্রষ্টব্য Before I fall
Down silent finally, I want to make
One last attempt at utterance...
Perhaps
Only the poem I can never write is true.
David Gascoyne. 'Apologia.'

বাহির্ হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে কেহ দেখে আর।
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া,
আর কল্পনার মায়া,
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।
(নবজাতক, পৃঃ ৬৮)

এমন যুগ কল্পনা করা কঠিন যখন রবীন্দ্রনাথের "কৃষ্ণ মুকুরে" ভাবুক ও রসিক-জন আকর্ষিত হবেন না, পথিক বারেক পথ হারাবেন না, আশ্চর্য বোধ করবেন না এই ভেবে যে এই সমস্ত লেখা একজন কবির, বা তার গোটা রহস্য তাঁর অধিগত হবে। "ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না"—কবিমাত্রেরই সেই দাবী। "এই শেষ কথা মোর"।

নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে
চিরকাল চোখে চোখে নূতন-নূতনালোকে
পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।